সপ্তদশ রাজ্য কাউন্সিলের দ্বিতীয় সভার আহ্বান

সংগঠন শক্তিকে সংহত করে বৃহত্তর সংগ্রাম আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে

নানা প্রতিকুল পরিস্থিতিতে সংগ্রাম আন্দোলনের ময়দানে ধারাবাহিক লড়াই চালিয়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মীদের মনে হতাশার কোন স্থান নেই — থাকতে পারে না। শোষকশ্রেণী- বিরুদ্ধ মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ সেনানীরা কখনও নতজানু হয়না, আপোষকামী যে কোন মানসিকতাকে তারা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে। পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র রাজ্য সরকারী কর্মচারী সমাজের দীর্ঘ আন্দোলনের ইতিহাস তা বারে বারে প্রমাণ করেছে। ষোড়শ লোকসভা নির্বাচন পরবর্তীতে যে নতুন চ্যালেঞ্জ হাজির হয়েছে, বিশেষত জাতীয় সরকারে এক চরম দক্ষিণপন্থী ও সাম্প্রদায়িক শক্তির ক্ষমতাসীন হওয়ার ঘটনা, তার বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই জারী রেখেই সমুখপানে অগ্রবর্তী হবে কর্মচারী সমাজ। রাজ্যস্তরে কর্মচারীদের উপর তীব্র আক্রমণ, শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে লড়াইকেও সেই সঙ্গে তীব্রতর করার আহ্বান জানানো হয়েছে রাজ্য কাউন্সিল সভা থেকে। এই কাজে সংগঠন শক্তিকে সর্বস্তরে সংহত করার বিষয়টিকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে গুরুত্বদানের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়েছে এই সভা।

প্রস্তাবনা পেশ করছেন মনোজ কান্তি গুহ

৫-৬ জুলাই, ২০১৪ কর্মচারী ভবনের 'অরবিন্দ সভাকক্ষে' ১৮টি জেলা, কলকাতার ৭টি অঞ্চল এবং অন্তর্ভুক্ত ও সহযোগী সমিতিগুলির উপস্থিতিতে রাজ্য কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভা পরিচালনা করেন সভাপতি অশোক পাত্র ও সহ-সভাপতি চুনীলাল মুখার্জী এবং চন্দন ঘোষকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। সভার প্রারম্ভে সাধারণ সম্পাদক রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির দীর্ঘদিনের নেতৃত্ব ও প্রবীণ সংগঠক সুশীল দাস-এর সেদিনই সকালে জীবনাবসানের সংবাদ সভাকে জানান। পরবর্তীতে সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষ থেকে সভায় তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে শোক প্রস্তাব পেশ করা হয়। আর একটি পৃথক শোক প্রস্তাবে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রাক্তন সহ-সভাপতি মধুসূদন বাগচী সহ এই সময়কালে ট্রেড ইউনিয়ন ও গণআন্দোলনের প্রয়াত নেতৃবর্গের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়।

কাউন্সিলে প্রারম্ভিক প্রস্তাবনা পেশ করেন সাধারণ সম্পাদক মনোজ কান্তি গুহ। প্রস্তাবনায় বিগত কর্মসূচীর পর্যালোচনা, ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতি, সাংগঠনিক অবস্থা এবং আগামী করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বক্তব্য তুলে ধরা হয়।

রাজ্যস্তরে সৃষ্ট জনবিরোধী এবং শ্রমিক-কর্মচারী স্বার্থ বিরোধী এক দুর্বিসহ পরিস্থিতিতে ৬টি সংগঠনের 'যৌথ কনভেনশন' বিপুল কর্মচারীদের উপস্থিতিতে অত্যন্ত সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কনভেনশনে গৃহীত নয় দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলির নেতৃত্বের পক্ষ থেকে পেশ করা হয়েছে। রাজ্যে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন, ফেডারেশন ও ১২ই জুলাই কমিটির আহ্বানে বন্ধ কলকারখানা খোলার দাবীতে কনভেনশন, ১ মে ২০১৪ আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস যথাযথ মর্যাদা সহকারে কর্মচারী ভবন ও সমিতিগুলির দপ্তরে এবং জেলায় জেলায় এমনকি কোন কোন মহকুমাস্তরে প্রতিপালন সহ বিগত কাউন্সিল সভার পরবর্তী সময়কালে

(সপ্তম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে)

জবাবী বক্তব্যে অসিত কুমার ভট্টাচার্য

১২ই জুলাই কমিটির ৪৯তম প্রতিষ্ঠা দিবসের সমাবেশ

সমাবেশে প্রধান বক্তা ডাঃ সূর্যকান্ত মিশ্র

"শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক যুক্ত আন্দোলন কমিটি ১২ই জুলাই কমিটির ৪৯তম প্রতিষ্ঠা দিবসের সমাবেশে আপনারা সমবেত হয়েছেন। ৪৮ বছর অতিক্রান্ত, ২ বছর পরে ১২ই জুলাই কমিটির ৫০ বছর পূর্তি। ২ বছর সময় সামনে আছে, আমি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি কি প্রেক্ষাপটে ১২ই জুলাই কমিটি গড়ে উঠেছিল। আপনাদের মনে করিয়ে দেওয়া আমার ধৃষ্টতা হচ্ছে, তবু মনে করিয়ে দিচ্ছি, মনে করিয়ে দিচ্ছি এই জন্য যে তখন এমন একটা প্রেক্ষাপট যে তখনকার মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন যে আগ্নেয়গিরি হয়েছে পশ্চিমবাংলা। সত্যিই তখন অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল কোনো সন্দেহ নেই। মানুষের ওপর আক্রমণ, কোথাও কোনো নিরাপত্তা ছিল না, শিক্ষকদের কোনো নিরাপত্তা ছিল না। প্রাথমিক শিক্ষক, মাধ্যমিক শিক্ষক হোক কাজের কোনো নিরাপত্তা ছিল না। কর্মচারীদের কি অবস্থা ছিল? কি অধিকার ছিল? সেই সব দিনের কথা, সে সময়ের উদ্দাম আন্দোলন। একই সঙ্গে আক্রমণ। মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নেই। দ্বিতীয় খাদ্য আন্দোলন ১৯৬৬ সাল। ফ্রেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি নুরুল ইসলামের শহীদ হওয়া। বসিরহাটের স্বরূপনগরে তাকে গুলি করা হল। মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে শহীদ হলেন আনন্দ হাইত, কৃষ্ণনগরে মাত্র ১৭ বছর বয়সে। উত্তাল তখন পশ্চিমবঙ্গ, তখন সংযুক্ত বামমোর্চা ছিল তারা এবং রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম কমিটি ছিল বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নগুলির। তারা হরতালের ডাক দিল। মার্চে হরতাল, এপ্রিলে হরতাল, আমি আপনাদের মনে করিয়ে দিচ্ছি শুধু তাই নয় এর সঙ্গে শিক্ষকদের আন্দোলন জেলায় জেলায় শিক্ষকদের অবস্থান —

(সপ্তম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে)

সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশন

জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভা

২১-২২ জুন ২০১৪ অল ইন্ডিয়া স্টেট গভঃ এমপ্লয়িজ ফেডারেশনের জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভা জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের গুলমার্গ-এ অনুষ্ঠিত হয়। জম্মু-কাশ্মীর কো-অর্ডিনেশন কমিটি অব ট্রেড ইউনিয়নস সভাটির ব্যবস্থাপনার মূল দায়িত্বে ছিল।

প্রথম দিন সভা শুরু হয় বেলা ১-১৫ মিনিটে। সভার শুরুতে সাধারণ সম্পাদক শহীদদের স্মরণ করে একটি শোক প্রস্তাব পাঠ করেন এবং এক মিনিট নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। মোট ৭৬ জন প্রতিনিধি এবং ১১ জন মহিলা প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। ১৬টি রাজ্যের ১৮ জন বক্তব্য রাখেন। মহিলা প্রতিনিধিদের পৃথক অধিবেশন দ্বিতীয় দিনে হয় এবং সেখানে ৮জন প্রতিনিধি বক্তব্য রাখেন।

আর মুথুসুন্দরম সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন পেশ করতে গিয়ে বর্তমান সময়ের নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতি এবং বিজেপি নামক প্রতিহিংসাপরায়ণ ও ধর্মান্ধ একটি রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে সরকার গঠন প্রসঙ্গে আলোকপাত করেন। তাঁর প্রস্তাবনায়

(সপ্তম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে)

পত্র নং কো-অর্ডি - ৪৭/১৪ **কলকাতা, তারিখ ঃ ১১ জুলাই, ২০১৪**

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী,
পশ্চিমবঙ্গ

বিষয় ঃ **বর্তমান বছরে কর্মচারীদের ঈদ উৎসব এবং শারদোৎসবের পূর্বে এডহক বোনাস, অগ্রিম এবং অবসারপ্রাপ্তদের অনুদান প্রদান সম্পর্কিত।**

মহাশয়া,

আপনি নিশ্চয়ই অবহিত আছেন যে, সরকারীভাবে স্বীকৃত এবং কর্মচারীদের অর্জিত অধিকার হিসাবে ৮.৩৩ শতাংশ এডহক বোনাস তথা এক মাসের বেতন প্রতিবছর কর্মচারীদের প্রাপ্য।

যদিও গতবছর কর্মচারীদের তা নির্দিষ্ট ২২,০০০.০০ টাকা বেতন পর্যন্ত উর্ধ্বসীমার ভিত্তিতে এডহক বোনাস হিসাবে সর্বোচ্চ ২৬০০ (দুই হাজার ছয় শত) টাকা, আর উর্ধ্বসীমার উপরের কর্মচারীদের ২,০০০ (দু'হাজার) টাকা হারে অগ্রিম এবং অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের জন্য অনুদান (এক্সগ্রাসিয়া) হিসাবে ১০০০ (এক হাজার) টাকা প্রদান করা হয়েছিল।

ইতোমধ্যে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের রমজান মাসের উপবাস শুরু হয়ে গিয়েছে এবং আগামী ২৯ জুলাই, ২০১৪ ঈদ-উল-ফিতর অনুষ্ঠিত হবে। তাই আসন্ন ঈদ-উল-ফিতর এবং আগামী শারদোৎসবের পূর্বে উক্ত কর্মচারীদের জন্য এডহক বোনাস, অগ্রিম এবং অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের জন্য অনুদান যথাযথ প্রাপ্য হারে প্রদানের জন্য একান্ত অনুরোধ জানাচ্ছি।

ধন্যবাদ সহ,

ভবদীয়
(মনোজ কান্তি গুহ)
সাধারণ সম্পাদক

প্রয়াত কমরেড সুশীল কুমার দাস

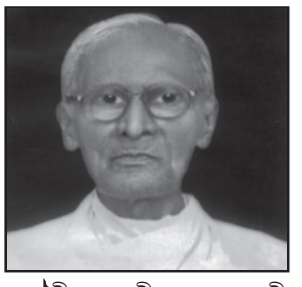

প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীণতম নেতা ও রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির গঠন পর্বের অন্যতম সংগঠক, পশ্চিমবঙ্গ সেক্রেটারিয়েট এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের নবপর্যায় আন্দোলনের কারিগর ও প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী পেনশনার্স সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং উক্ত সংগঠনের প্রাক্তন উপদেষ্টা কমরেড সুশীল কুমার দাস গত ৫ জুলাই ২০১৪ বিধাননগরে একটি বেসরকারী হাসপাতালে প্রয়াত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর। তাঁর দুই পুত্র, দুই কন্যা বর্তমান। তিনি দীর্ঘদিন দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত ছিলেন।

সংক্ষিপ্ত জীবনী ঃ কমরেড সুশীল কুমার দাস অবিভক্ত বাংলাদেশের বরিশাল জেলায় ১৯২১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ঐ জেলার ধামুর গ্রামে ছিল তাঁর বাড়ি। তাঁর পিতা নিশিকান্ত দাস ছিলেন খুলনার জমিদার বাড়ির নায়েব। খুলনার ব্রজলাল হিন্দু অ্যাকাডেমি (বর্তমান ব্রজলাল গভঃ কলেজ) থেকে তিনি স্নাতক পরীক্ষার বিজ্ঞান শাখা থেকে পাশ করেন। ১৯৪২ সালে বরিশাল কালেক্টরেটে চাকরি পান। ঐ সময়েই তিনি তাঁর নিজস্ব গ্রামে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বর্তমানে সেটি ধামুরা মাধ্যমিক বিদ্যালয় হিসাবে পরিচিত। ছাত্রাবস্থায় তিনি বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। অন্যদিকে স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গেও তিনি যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। একইসাথে সাম্যবাদের আদর্শে তিনি দীক্ষিত হয়েছিলেন। এই অপরাধে ১৯৪৪ সালে তিনি চাকরিচ্যুত হন। চাকরিচ্যুত হওয়ার পরে তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৪৫ সালে তিনি মহিলা আন্দোলনের নেত্রী কমলা দাসের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। স্বাধীনতা ও দেশভাগের পরে কিছু ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি এবং তাঁর পরিবার ১৯৪৮ সালে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং পশ্চিমবঙ্গে বসবাস করতে শুরু করেন।

(সপ্তম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে)

কর্মচারী সংগঠনগুলির মধ্যে একমাত্র রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি উৎসব বোনাস ও অগ্রিম প্রদানের দাবি জানিয়ে রাজ্য সরকারকে পত্র প্রদান করে। বিশেষত ঈদ উৎসবের পূর্বেই এ সংক্রান্ত ঘোষণা করার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে পত্র মারফৎ বলা হয়। পত্র প্রদানের পরবর্তীতে রাজ্য সরকার বোনাস ও অগ্রিম সংক্রান্ত ঘোষণা করে।

সংগ্রামী হাতিয়ার

জুলাই ২০১৪
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র
৪৩তম বর্ষ □ তৃতীয় সংখ্যা □ মূল্য এক টাকা

সম্পাদকীয়

কেন এই প্রতিক্রিয়াহীন জীবন-চর্চা

প্রতিক্রিয়া দেখানো বা প্রতিক্রিয়া ঘটানো—দুই-ই মানুষের সহজাত। ক্ষোভ-দুঃখ-আনন্দ, হাসি-কান্না—সবকিছুই মানুষের প্রতিক্রিয়ার বিভিন্ন ধরনের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। প্রতিক্রিয়ার রকমফের নির্ভর করে কোনো একটি বিষয়কে, কোনো একটি ঘটনাকে একজন ব্যক্তি মানুষ কিভাবে দেখছেন তার ওপর। ভালো লাগলে একরকম, খারাপ লাগলে আর একরকম। খুব ভালো লাগা, বা খুব খারাপ লাগাতেও প্রতিক্রিয়া হয় এক একরকম। প্রতিক্রিয়া নিয়ে এত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের কারণই হল, বর্তমান সময়ে এমন বহু বিষয় মানুষের সামনে—আমাদের সামনে রয়েছে, যা দেখে বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া ঘটাটাই স্বাভাবিক। এককভাবে, যৌথভাবে, দলবদ্ধভাবে—যেমন ভাবেই হোক না কেন। কিন্তু প্রশ্ন, যা স্বাভাবিক, যা উচিত, তা কি ঘটছে? না ঘটছে না। অন্তত যে মাত্রায় হওয়া সঙ্গত, তা তো হচ্ছেই না। যেভাবে অতীতে হত, তা'ও নয়। কেন? কেন এমন প্রতিক্রিয়াহীন জীবন-চর্চা? প্যালেস্টাইনের ওপর গাজা ভূখণ্ডে নৃশংস আক্রমণ চালাচ্ছে ইজরায়েল। প্রতিদিন শয়ে-শয়ে অসামরিক মানুষ, নারী-শিশু-বৃদ্ধ এই ঘৃণ্য বর্বর অক্রমণের শিকার হচ্ছেন। টেলিভিশনের পর্দায়, সংবাদপত্রের পাতায় ছোট ছোট ফুলের কুঁড়ির মতো নিষ্পাপ শিশুগুলোর রক্তাক্ত ছবি। আমরা দেখছি আর নিষ্পৃহভাবে চ্যানেল ঘোরাচ্ছি, পাতা উল্টে চলেছি—প্রতিক্রিয়া কোথায়? ছবিগুলো দেখেও কি আমাদের ভেতরটা কাঁদে না? মনে হয় না, কি অপরাধ এই শিশুগুলোর? এরাও তো আমাদের ঘরের সন্তানের মতোই খেলার জন্য বায়না করত, রাতের বেলা মায়ের পাশে শুয়ে গল্প শুনতে চাইত...

টানা বাড়ছে জিনিসের দাম। চাল, ডাল, তেল, মাছ-মাংস, সব্জি, দুধ—সব কিছুই আজকের বাজার দর আর কালকের বাজার দর এক জায়গায় থাকছে না। কোথায় প্রতিক্রিয়া? কখনও কখনও যদি বা ক্ষোভ উগড়ে দিচ্ছি, তাও ভুল জায়গায়। সব্জিওয়ালা, মাছওয়ালা যারা ডালা সাজিয়ে বসেছে তাদের ওপরেই যত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু সত্যিই কি বাজার দর ঠিক করায় ওদের কোন হাত থাকে? বাড়ল রেল ভাড়া, যাত্রী ও পণ্যভাড়া দুই-ই। মাঝে মাঝেই বাড়ছে পেট্রোল আর ডিজেলের দাম। যেকোনো দিন বাড়বে রান্নার গ্যাস আর কেরোসিনের দাম। এত ঢাক-ঢোল পিটিয়ে নির্বাচন হল, এক দল গেল আর এক দল এল, শোনা গেল ভীরু ও দুর্বল একজন মানুষের পরিবর্তে, সাহসী ও সবল একজন মানুষ দেশের হাল ধরেছেন! কিন্তু 'আচ্ছে দিন'-এর সামান্যতম আভাসও তো টের পাওয়া যাচ্ছে না। কোথায় প্রতিক্রিয়া?

যদিও বা ছেড়ে দিই বিশ্বের কথা, দেশের কথা, কিন্তু আমাদের রাজ্য? আমাদের ঘরের চারপাশে তো কত ঘটনা ঘটছে। আমাদের ভালো লাগে না, লাগতে পারে না এমন কত ঘটনা—বাজারের আগুন নেভানোর জন্য নাকি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছিল। তাঁরা সংবাদ মাধ্যমকে সাথে নিয়ে দু-চারদিন ঘুরে বেড়ালেন বৈঠকখানা বাজার, মানিকতলা বাজার, যদুবাবুর বাজার...। ব্যাস্ তারপরেই উবে গেলেন কর্পূরের মতো। আমরাও নীরব। কয়েক বছর আগে বেশ কিছু শিল্প আসার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। মনে হচ্ছিল বেকার ছেলে-মেয়েদের কাজের সুযোগ তৈরি হবে। কিন্তু তাদের তাড়ানো হল, আমরা চেয়ে চেয়ে দেখলাম। আর আজ তো কেউ আসতেই চাইছে না। আসবে কোথায়, জমি পাওয়া যাবে কি, পরিকাঠামোর অবস্থা কি?—কোনো কিছুরই সদুত্তর নেই সরকারের কাছে। যারা এসে পড়েছিল, শিল্প চালু হয়েছিল অথবা হওয়ার মুখে—মাস্তানি আর তোলাবাজির ঠেলায় তারাও বাক্স-প্যাঁটরা গুটিয়ে ফেলতে চাইছে। শিল্প না হওয়া মানে আমাদের ঘরের ছেলে-মেয়েদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। এটা আমরা বুঝি না, তা না। কিন্তু বুঝেও চুপ। কোনো প্রতিক্রিয়া নেই আমাদের মধ্যে।

নতুন শিল্প তো দূরের কথা, যা ছিল তা'ও একের পর এক বন্ধ হচ্ছে। হিন্দমোটর, ডানলপ, ডাকব্যাক, শালিমার পেন্টস্... চটশিল্প, চা বাগান, যেন মড়ক লেগেছে শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে। যাঁদের রুটি-রুজি ছিল তাঁরাও আজ বেকার বাহিনীতে নাম লেখাচ্ছেন। যাঁদের ঘরে উনুন নিভে যাচ্ছে, প্রতিবাদ করার দায়িত্ব কি শুধু তাঁদেরই? আমার পাশের বাড়িতে হিন্দমোটরের উপোসী কর্মচারী, অথচ আমরা নির্লিপ্ত!

শিক্ষক হবার স্বপ্ন চোখে নিয়ে টেট পরীক্ষায় বসেছিল মেয়েটি। মেধা তালিকায় স্থানও পেল, কিন্তু চাকরি পেল না। চাকরি পেল এমন একজন যার মেধা তালিকায় নামও ছিল না। অপমানে-হতাশায় আত্মহত্যা করল মেয়েটি। ওর মায়ের বুক ফাটা আর্তনাদ হয়তো আমাদের কানে পৌঁছলো, কিন্তু আমাদের ভেতরের প্রতিক্রিয়াকে ঠেলে বাইরে আনতে পারলো না। এখনও মেয়েটির বন্ধুরা অনশন করছে। সরকার নির্লিপ্ত। আমরাও এত ব্যস্ত যে ওদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য একটুও সময় বের করতে পারি নি।

সুদীপ্ত গুপ্ত, রাস্তায় নেমেছিল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য। দড়ি ধরে মারো টান, রাজা (রানী) হবে খান্ খান—এমন কোনো রাষ্ট্রদ্রোহিতার স্লোগান সে উচ্চারণ করেনি। তবুও তাকে পিটিয়ে মারল পুলিশ। একজন তরতাজা মেধাবী যুবকের নৃশংস হত্যা। আমাদের চোখের কোল ভিজেছিল? যে মেয়েগুলোর প্রাণ পাশবিক লালসার শিকার হয়ে অকালে ঝরে যাচ্ছে প্রায় প্রতিদিনই, তাদের জন্য আহা রে, ইস্ এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে আমাদের প্রতিক্রিয়া?

হত্যাকারী, হত্যায় প্ররোচনাকারীরা বুক ফুলিয়ে পুলিশের নাকের ডগায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। আদালতের বারংবার নির্দেশ সত্ত্বেও প্রশাসনের কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙছে না। মঞ্চ আলো করে বসে থাকছে খুনীরা। আমরা পাশ দিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু ঘৃণায় কুঁকড়ে উঠছি না!

রাজ্য প্রশাসনের কর্মচারী আমরা। দু'জন রাজ্য সরকারী কর্মচারী (কলকাতা পুলিশ ও রাজ্য পুলিশের) খুন হয়ে গেলেন, তথাপি আমাদের নাগরিক সত্ত্বা যেমন গুটিসুটি মেরে খোলসের মধ্যে ঘুমিয়ে রয়েছে, তথৈবচ আমাদের কর্মচারী সত্ত্বাও। আমাদের দাবি-দাওয়া উপেক্ষিত। অধিকার বিপন্ন। সরকার-কর্মচারী সম্পর্ক আবার ঘুরে-ফিরে অতীতের মতো প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কে পরিণত হচ্ছে। আত্মসম্মান, মর্যাদা যা কিছু অর্জিত হয়েছিল তা সবই যেতে বসেছে। অথচ আমাদের শরীরী ভাষায় এগুলি পুনরুদ্ধারের জেদের বহিঃপ্রকাশ এখনও ঘটছে না। আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য আত্মসমর্পণের ভ্রান্ত পথও কখনও কখনও অনুসরণ করছি আমরা।

স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ ভুলতে বসেছি আমরা। আবার যখন এসব কিছুর বিরুদ্ধে সংগঠিত প্রতিবাদের আয়োজন করা হচ্ছে, আমাদের ডাকছে, আমরা অনেকেই যাচ্ছি না, উল্টে বিরক্ত। খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, আবার মিছিল? কি দরকার ঝামেলায় জড়ানো।

কিন্তু সত্যিই কি এমন হাজারো নির্লিপ্ততা নিয়ে ভালো থাকা যায়? অন্যায়ে কাছে আত্মসমর্পণ করে কি অন্যায়কে রোখা যায়? কখনই নয়, কোনোদিনও নয়। আমাদের পূর্বসূরীরাও সাতের দশকের সন্ত্রাসের পরিবেশে, জরুরী অবস্থার সময় যদি এমনই প্রতিক্রিয়াহীন জীবন-চর্চায় মগ্ন থাকতেন, পেতাম কি আমরা উপহার হিসেবে বিপুল অধিকার অর্জনের সুদীর্ঘ এক পর্ব?□

৩০ জুলাই ২০১৪

'রত্নগর্ভা' বাংলা!

প্রকৃত অর্থেই আমাদের প্রিয় বঙ্গভূমি বর্তমানে রত্নগর্ভা হইয়া উঠিয়াছে। কার্যত প্রত্যহ নূতন নূতন রত্নের আত্মপ্রকাশ ঘটিতেছে। মুদ্রণ ও দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যমগুলিতে উহাদের কীর্তি-কাহিনী ফলাও করিয়া প্রচারও হইতেছে। যাহা অবলোকন করিয়া বঙ্গবাসী নিশ্চিতরূপেই শিহরিত। কতিপয় বৎসর পূর্বে যে পরিবর্তনকে আবাহন করিয়া আনা হইয়াছিল, তাহা যে দ্রুত এইরূপ ফলদায়ী হইবে, সম্ভবত কেহই কল্পনাও করিতে পারেন নাই। এমনকি বিদ্বজ্জন, যাঁহারা সমস্বরে 'পরিবর্তন চাই' বলিয়া আসর উত্তপ্ত করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরও একাংশ লজ্জায় মুখ ঢাকিতেছেন। অপর অংশ অবশ্য পরিবর্তন-এর স্বাদ আকণ্ঠ উপভোগ করিয়া তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলিতেছেন। যাহা হউক, উহা ভিন্ন প্রসঙ্গ। এক্ষণে আমরা বঙ্গভূমির বিভিন্ন প্রান্তে নব্যউদিত রত্নরাজির প্রতি আলোকপাত করিতে চাহি।

মহারাজা বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় 'নবরত্ন'-এর ঠাঁই হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে বঙ্গীয় রাজনীতিতে অসংখ্য রত্ন কিলবিল করিতেছে। চক্ষু মেলিয়া চাহিলেই মহল্লায় মহল্লায় এমন রত্নের সন্ধান মিলিবে। ইহাদের কেহ নির্মাণ শিল্পকে নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য 'সিন্ডিকেট' খুলিয়া তাহার মাথায় বসিয়াছে, কেহবা শিল্প বিনিয়োগে আগ্রহী শিল্পপতির ললাটে রিভলবার ঠেকাইয়া তোলাবাজিতে পারদর্শী, আবার কেহবা সূর্য অস্ত যাইলেই আদিম রিপুর তাড়নায় বঙ্গললনাদের শিকার করিতে চাহে। নিজ নিজ কীর্তিকলাপের সুবাদে ইহারাও সংবাদ মাধ্যমে প্রায় প্রত্যহই স্থান পাইতেছে। তথাপি পরিবর্তনপন্থী বঙ্গীয় রাজনীতির 'হায়াররকি'-তে ইহাদের অবস্থান দ্বিতীয় শ্রেণীতে। কারণ প্রশাসনিক চক্ষুলজ্জার খাতিরে ইহাদের কখনও কখনও পুলিশের জালে ধরা পড়িতে হয়। কতিপয় দিবস 'মাতুল গৃহ'-এর হাওয়া খাইবার পর, যথারীতি তাহাদের সুমহান কীর্তিগুলিকে লিপিবদ্ধ করিয়া কোন চার্জশিট আদালতের সম্মুখে পেশ করিতে পুলিশ অকৃতকার্য হয় এবং রত্নগণও অনায়াসে 'বেইল' পাইয়া পুনরায় সমাজজীবনে পঙ্ক ছড়াইতে ব্যাপৃত হয়।

কিন্তু ইহাদের তুলনায় অধিকতর ভাস্বর হইলেন, প্রথম শ্রেণীর রত্ন শ্রেণীভুক্ত যাঁহারা। ইহাদের কাহারও হস্তযুগল ও পদযুগল অতীব সক্রিয়। অন্যতম এক রত্ন তো বুক ফুলাইয়া ঘোষণা করিয়াছেন, যে তিনি তাহার পদযুগলের মাধ্যমে তিনজনকে পিষ্ট করিয়া হত্যা করিয়াছেন। কেহ আবার অধ্যাপিকার ললাট লক্ষ্য করিয়া জলের পাত্র ছুঁড়িয়া মারিতে সিদ্ধহস্ত। কেহ কেহ আছেন যাঁহারা মুখ খুলিলেই কণ্ঠ হইতে অপরাধ জগতের ভাষা অক্লেশে নির্গত হইতে থাকে। এমন প্রথম শ্রেণীর রত্নমণ্ডলীর অনেকেই জনপ্রতিনিধি। কিন্তু সম্ভবত তাঁহারা জনপ্রতিনিধির দায়িত্ব বিস্মৃত হইয়াছেন। উহাদের কাজ হইল দ্বিতীয় শ্রেণীর রত্নগণকে অন্যায় কাজে লিপ্ত হইবার জন্য প্ররোচিত করা। প্ররোচনামূলক বক্তব্য গুলিরও ক্রমবিবর্তন লক্ষ্য করা যাইতেছে। আক্রমণ, হত্যা ইত্যাদির পর্ব অতিক্রম করিয়া সম্প্রতি তাহা দলবদ্ধভাবে ধর্ষণ করিবার নির্দেশে পর্যবসিত হইয়াছে। এবং এই সুমহান (!) কীর্তিটি স্থাপন করিয়াছেন একদা রূপালি পর্দার নায়ক এবং বর্তমানে এই রাজ্য হইতে নির্বাচিত অন্যতম সাংসদ। চলচ্চিত্রে একদা যিনি সরল, অপাপবিদ্ধ চরিত্রে অভিনয় করিয়া জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিলেন, বাস্তব জীবনে তাঁর ভূমিকা লুম্পেন চক্রকেও লজ্জা দিবে।

পরমাশ্চর্যের বিষয় হইল, বঙ্গীয় রাজনীতির এহেন কলুষিত করিবার অপচেষ্টাকে ছোট ছোট দামাল শিশুদের দুষ্টুমি হিসেবে অভিহিত করা হইতেছে। বিভিন্ন সভা-সমাবেশে উক্ত রতনরাজি 'কোহিনুর' রত্নের সহিত একই মঞ্চ আলোকিত করিতেছেন। সুতরাং বঙ্গভূমিতে অপরাধ এখন আগ্নেয়গিরির গলিত লাভার ন্যায় বল্গাহীন।

পুনশ্চ ঃ রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ প্রমুখ মনীষীগণের ছবিগুলির দিকে তাকাইলে বোধ হয় তাঁহারাও দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছেন। □

১৩ শ্রাবণ ১৪২১

শ্রদ্ধা-স্মরণে কমরেড মধুসূদন বাগচী

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি, কৃষি কারিগরী কর্মী সংস্থা ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী পেনশনার্স সমিতির উদ্যোগে গত ১৫ জুলাই, ২০১৪ কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল হলে কমরেড মধুসূদন বাগচীর স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। গত ২৫ জুন '১৪ ভোর ৩টা নাগাদ ৮৬ বছর বয়সে তিনি প্রয়াত হন।

এই স্মরণসভায় রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সহ সভাপতি চুনীলাল মুখার্জী, কৃষি কারিগরী কর্মী সংস্থার সহ সভাপতি অনল বসু ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী পেনশনার্স সমিতির সহ সভাপতি সুবল রায় দ্বারা গঠিত সভাপতিমণ্ডলী সভা পরিচালনা করেন।

সভা শুরু হয় কমরেড বাগচীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে। তিনটি সংগঠন এবং সভায় উপস্থিত সমিতিগুলি, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অঞ্চলসমূহ এবং বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে মাল্যদান করা হয়।

সভায় রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক মনোজ কান্তি গুহ স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে বলেন, কমরেড বাগচী ছিলেন সংগঠন গড়ার কারিগর। সন্ত্রাসের বাতাবরণে ৬০ এর দশক থেকে ৭০ এর দশকে তিনি শুধু নিজের সমিতি কৃষি কারিগরী কর্মী সংস্থা নয়, কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ করে অন্যান্য সমিতি ও রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিকে গড়ে তোলার কাজ করে গিয়েছেন। এখন এক নতুন মাত্রায় অস্থির পরিস্থিতি। প্রশাসনের পক্ষ থেকে লাগাতার আর্থিক বঞ্চনার সাথে যুক্ত হয়েছে সংগঠনকে ভেঙ্গে দেওয়ার চক্রান্তে নির্বিচার বদলী। মাঝারি থেকে উচ্চস্তরের কোন নেতৃত্ব ছাড় পাচ্ছেন না। একটা বদলী ভীতি তৈরী করার চেষ্টা চলছে। কমরেড মধুসূদন বাগচীর মত স্থপতিদের প্রতি যদি প্রকৃত শ্রদ্ধা দেখাতে হয় তাহলে তাদের চেতনাদীপ্ত সাহস থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেদের জারিত করে আমাদের লড়াইয়ের পথে যেতে হবে।

কৃষি কারিগরী কর্মী সংস্থার সাধারণ সম্পাদক তথা রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সুনির্মল রায় স্বল্পকথায় বলেন, কমরেড বাগচীর সাথে প্রজন্মের ফারাক থাকলেও যখনই দেখা হয়েছে বয়সকালীন অসুস্থতা সত্ত্বেও সমিতির প্রতি, সমিতির নেতৃত্বের প্রতি ভালোবাসায় ভরিয়ে দিয়েছেন তিনি।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী পেনশনার্স সমিতির সাধারণ সম্পাদক অজয় সেন শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে বলেন, শ্রমজীবী

সুনির্মল রায়

মানুষের দাবিদাওয়া আদায়ের জন্য সচেতন মানুষ হিসাবে শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গীতেই সংগঠিত করতে চেয়েছিলেন তিনি। ১২ই জুলাই কমিটির পক্ষ থেকে যুগ্ম আহ্বায়ক সমীর ভট্টাচার্য সমবেদনা জানিয়ে বলেন আজকের প্রজন্মের পক্ষে কমরেড মধুসূদন বাগচীকে তার কাজকে জানা বোঝা মুশকিল। সেই সময় তাঁর শ্রেণীমমত্ববোধ ও সংগঠনগুলির মধ্যে ঐক্য রক্ষার কাজ অনুকরণীয়। স্মৃতিচারণা এই জন্য যাতে তাঁদের দেখানো পথ কিভাবে আমরা আমাদের জীবনে প্রয়োগ করতে পারি।

সভায় উপস্থিত ছিলেন কমরেড মধুসূদন বাগচীর সুযোগ্য পুত্র ও কন্যা ভাস্কর বাগচী ও রূপা বাগচী। পরিবারের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে গণ আন্দোলনের নেত্রী ও কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের বিরোধী দলনেত্রী রূপা বাগচী বলেন, বাবা আমার কাছে ছিলেন রাজনীতি করার ক্ষেত্রে অন্যতম পথপ্রদর্শক। সংগঠনের কাজে বাইরে রাত কাটানোর ক্ষেত্রে পরিবারের বাধা কাটিয়ে ধীরে ধীরে আজকের অবস্থানে পৌঁছবার ক্ষেত্রে 'বাবা' ছিলেন অন্যতম শক্তি। আরো বলেন, ওনার ছিল অসাধারণ অনুমান ক্ষমতা। বিভিন্ন জেলার সংগঠন করতে গিয়ে সফর কালে রূপা বাগচী পেয়েছিলেন কমরেড বাগচীর নানান জেলার সহকর্মীদের আবেগপূর্ণ ভালোবাসা। কমরেড বাগচী যে কি জনপ্রিয় ছিলেন কর্মচারী সমাজে, এ ধরনের ঘটনা তার প্রমাণ।

সবশেষে বক্তব্য রাখেন কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীণ নেতা অজয় মুখোপাধ্যায়। অতীত দিনের নানা ঘটনা উল্লেখ করে উনি কমরেড বাগচীর নানান দিককে তুলে ধরেন। এবং বর্তমান প্রজন্মকে অতীতের এই

রূপা বাগচী

গৌরবোজ্জ্বল ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে বর্তমানে রাজ্যে ও কেন্দ্রে যে জনবিরোধী সিদ্ধান্তসমূহ কার্যকর হচ্ছে, কর্মচারী তথা মেহনতী মানুষকে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার আহ্বান জানান।

রাজ্য সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীণ সংগঠক, কৃষি কারিগরী কর্মী সংস্থার প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রাক্তন সহ-সভাপতি ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী পেনশনার্স সমিতির প্রাক্তন সহ-সভাপতি কমরেড মধুসূদন বাগচীর এই স্মরণসভার সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষে চুনীলাল মুখার্জীর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে পরিসমাপ্তি ঘটে। □

মানস দাস

সাধারণ বাজেট ২০১৪-১৫

গতি বৃদ্ধি করে চিদাম্বরম এক্সপ্রেসে সওয়ার জেটলি

মানস কুমার বড়ুয়া

বিগত ১০ জুলাই সংসদে নবগঠিত কেন্দ্রের বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ সরকার তার সাধারণ বাজেট পেশ করেছে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির পেশ করা এই সাধারণ বাজেট বিগত ইউ পি এ সরকারের লক্ষ্য ও অভিমুখে অবিচল থেকেছে। এই বাজেটের মধ্য দিয়ে নয়া উদার আর্থিক নীতিকে বিজেপি সরকার যে আরও কঠোর ভাবে প্রয়োগ করবে এমন ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। 'আচ্ছে দিন আনেওয়ালে হ্যায়' এই স্লোগানে যাঁরা ভুল বুঝে সুর মিলিয়েছিলেন সেই সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ এই বাজেটে চূড়ান্তভাবে বঞ্চিত হয়েছেন। অপরদিকে উপরোক্ত স্লোগানটি প্রকৃতপক্ষে যাদের স্বার্থবাহী ছিল সেই কর্পোরেট মহল, ধনী সমাজ— এই বাজেট তাদেরও প্রত্যাশা সম্পূর্ণ পূরণ করতে পারেনি। তারা চেয়েছিল নয়া উদার আর্থিক নীতি লাগু করার ক্ষেত্রে যাতে নতুন সরকার বেপরোয়া, নিষ্ঠুর হয়। তবে তাদের সেই প্রত্যাশা কোথাও কোথাও ধাক্কা খেলেও, তারা এই বাজেটের মধ্যে ভবিষ্যৎ প্রত্যাশা সুদে আসলে পূরণের ইঙ্গিত পেয়েছেন। আসলে নয়া উদারনীতির প্রবক্তারা মনমোহন সিংকে ছেড়ে নির্বাচনের পূর্বে নরেন্দ্র মোদীকে শংসাপত্র দিয়েছিলেন এই কারণেই যে মনমোহন সিং নয়া উদারবাদী সংস্কার করতে যে যে ক্ষেত্রগুলিতে গড়িমসি করেছেন সেই সেই ক্ষেত্রগুলিতে গুজরাট দাঙ্গা ও তথাকথিত উন্নয়ন মডেলের নায়ক নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় এসেই সংস্কারের স্টিম রোলার চালিয়ে দিতে সক্ষম হবেন। ওদের সেই প্রত্যাশা আরো আকাশচুম্বী হয়ে ওঠে যখন ক্ষমতাসীন হওয়ার কদিন পর প্রধানমন্ত্রী 'তেতো দাওয়াই' দেওয়ার কথা বলেন। সেই অনুযায়ী বাজেট সাধারণ মানুষের কাছে তেতো হলেও কুইনাইনের মতো অখাদ্য কেন করা হলো না তাই নিয়ে কর্পোরেট মহল কিছুটা হতাশ।

সেই হতাশা ফুটে উঠেছে কর্পোরেট প্রচার মাধ্যমে। বাজেট পেশের পরদিন ১১ জুলাই আনন্দবাজার পত্রিকা প্রথম পাতায় বড় করে শিরোনাম করেছে — ''মাঝমাঠেই বন্দি মোদী'', তার তলায় উপশিরোনাম ''অভিজ্ঞতার অভাবে থমকে বড় সংস্কার।'' ঐ দিনই ঐ পত্রিকা পাঁচের পাতায় 'অন্তবর্তী' শিরোনামে সম্পাদকীয়তে লিখেছে — ''..... সংস্কারের পথে যে দৃঢ় পদক্ষেপের অঙ্গীকার তাঁহার বাজেটে প্রত্যাশিত ছিল, জেটলির বাজেট সেই স্তরে পৌঁছায় নাই। ..... এই বাজেটে সংস্কারের কিছু প্রত্যাশিত আভাস থাকিলেও তাহার গতিপথ পূর্বসুরির অনুবর্তী।... বহুক্ষেত্রেই জেটলি চিদম্বরমের ঘোষিত সংখ্যাগুলিকেই মান্য জ্ঞান করিয়াছেন।.... কেন প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও ভর্তুকি সংস্কার হইল না?... কেন জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান যোজনার অকুশলতা স্পষ্ট হইবার পরেও তাহার দায় বহন করা হইবে? বিলগ্নীকরণ প্রসঙ্গটিও বাজেটে যথেষ্ট গুরত্ব পায় নাই। পেনশন তহবিল বা খুচরা ব্যবসায়ে বিদেশি বিনিয়োগের প্রশ্নও কেন উত্তরহীন থাকিল? নমনীয় শ্রমআইনের প্রসঙ্গেও বাজেট নীরব।'' —এ রাজ্যের একমাত্র পত্রিকা যারা ঘোষণা করে স্বীকার করেছে যে তারা নব্য উদারনীতির পক্ষে, সেই পত্রিকার সম্পাদকীয়তে তারা যে নিষ্ফল প্রত্যাশার কথা শুনিয়েছে তা আমাদের কাছে ভয়ংকর ইঙ্গিতবাহী।

অন্যতম জাতীয় দৈনিক 'দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া' ঐ দিন প্রথমপাতায় শিরোনাম করেছে, ''লঙ অন ওয়ার্ডস, বাট শর্ট অন র‍্যাডিক্যাল রিফর্ম।'' ঐদিনই 'দ্য হিন্দু' শিরোনাম করেছে 'কশাস স্টার্ট'।

১৩ জুলাই ২০১৪ বাজেটকে কেন্দ্র করে নয়া উদার আর্থিক নীতির সমর্থক বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ স্বামীনাথন এস আঙ্কলেসারিয়া আয়ার 'দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া'র ২০-র পাতায় একটি নিবন্ধ লিখেছেন যার শিরোনাম, 'জেটলি ডনস আ পিসি মাস্ক' অর্থাৎ পি চিদাম্বরমের মুখোশ পরেছেন জেটলি। সেখানে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে বাজেটে ইউ পি এ জমানার দেখানো পথকেই অনুসরণ করেছে বিজেপি সরকার। একই সাথে উদারনীতির চাবুক আরও ব্যাপকভাবে না চালানোর জন্য জেটলির সমালোচনাও করেছেন। এই স্বামীনাথন মহাশয় বাজেট পেশ হওয়ার আগের দিন ৯ জুলাই 'দ্য ইকনমিক টাইমস্' পত্রিকায় লেখা একটি নিবন্ধে বিজেপি সরকারকে বিপজ্জনক কিছু পরামর্শ দিয়েছিলেন। সেই লেখায় মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে তিনি সওয়াল করেছেন। তিনি সরাসরি লিখেছেন যে ভর্তুকি ব্যবস্থা ও মূল্যনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তুলে দিতে হবে। তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, একটু একটু করে ভরতুকি প্রত্যাহার করলে সাধারণ মানুষকে ক্ষুব্ধ না করে আসল লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়। এই নিবন্ধটিতে স্বামীনাথনের বক্তব্য থেকেই বোঝা যায় যে, কর্পোরেট মহলের প্রত্যাশার পারদ সর্বোচ্চ জায়গায় পৌঁছেছিল এই সাধারণ বাজেটকে ঘিরে। সেই দিক দিয়ে ঐ মহল অখুশী না হলেও কিছুটা হতাশ। পি পি পি ব্যাপকভাবে চালু করা, এফ ডি আই-এর সুযোগ বৃদ্ধি করা, কর্পোরেটদের অন্যান্য সুযোগ সুবিধাগুলি খুবই কম ওদের কাছে।

সাধারণ মানুষের কাছে এই বাজেট একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। ইউ পি এ সরকারের ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তে পেশ করা অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট আর বিজেপি সরকারের ১০ জুলাই-এর পূর্ণাঙ্গ বাজেট উভয়ই একই নীতি অনুযায়ী পেশ করা হয়েছে। এই বাজেটের মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের উপর আর্থিক বোঝা আরো বাড়বে। নতুন ইউরিয়া নীতির ফলে সারের দামের উপর সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। ভরতুকি কমানোর ইঙ্গিতের মধ্য দিয়ে খাদ্য সুরক্ষা আইনের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। কৃষি, গ্রামীণ উন্নয়ন, সামাজিক সুরক্ষা—সর্বক্ষেত্রে বরাদ্দ কমেছে এই বাজেটে। শিক্ষা ক্ষেত্রকে বেসরকারীকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। স্কুল শিক্ষা, সাক্ষরতা এবং উচ্চশিক্ষায় যোজনা বরাদ্দ ছয় শতাংশ করা হয়েছে। মিড ডে মিল খাতে বরাদ্দও প্রকৃত অর্থে ১০ শতাংশ কমেছে। ইউ জি সি-র ক্ষেত্রে বরাদ্দ করা অর্থের পরিমান ৩২ শতাংশ কমান্যো হয়েছে। বাজেটের মধ্য দিয়ে সরকারের কৃষক বিরোধী চরিত্রও স্পষ্ট হয়েছে। জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্প (রেগা) কে শর্তাধীন করে প্রকল্পটিকে লঘু করে দেওয়া হয়েছে। আর্থিক সমীক্ষা ২০১৩-১৪ তে বলা হয়েছে ২০০৪-০৫ থেকে ২০১১-১২ সমগ্র দেশে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির বার্ষিক হার মাত্র ০.৫ শতাংশ (অধ্যায় ১, পৃষ্ঠা ২৭)। এই কঠিন বাস্তবতার মুখে দাঁড়িয়ে রেগার মতো প্রকল্প থেকে সরকার যদি হাত গুটিয়ে নেয় তাহলে বেকারত্ব আরও ভয়াবহ চেহারা নেবে।

সর্বোপরি ২০১৪-১৫ সালের বাজেটে মোট ব্যয় গত বছরের তুলনায় মাত্র ১১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। অথচ গত আর্থিক বছরের বাজেটে অর্থ বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ১৩ শতাংশ। মুদ্রাস্ফীতির ক্রমবর্ধমান হারকে মাথায় রাখলে এবারের বাজেটে ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি হয়নি বললেই চলে। এই ভাবে সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত করে রাজস্ব ঘাটতি নির্ধারিত মাত্রার মধ্যে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ সি পি চন্দ্রশেখর এবারের বাজেট প্রসঙ্গে বলেছেন যে, এন ডি এ সরকার আর ইউ পি এ সরকারে দুটি বিষয়ে মিল আছে। সেগুলি হল উভয় সরকারই শিল্পপতিদের উপর কর চাপাতে অনাগ্রহী এবং সাধারণ মানুষের জন্য অর্থ বরাদ্দ করতে অসমর্থ। কারণ করের মাধ্যমে সম্পদ সংগ্রহ যদি না হয়, তাহলে বর্ধিত ব্যয় সরকারের ঘাটতি বাড়িয়ে দেবে। তাই প্রয়োজন ভরতুকি প্রত্যাহারের মাধ্যমে এবং সামাজিক ও অন্যান্য খাতে ব্যয় সঙ্কোচনের মাধ্যমে আর্থিক ঘাটতি হ্রাস করা। এবারের বাজেট এই পথেই এগিয়েছে।

কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ক্ষেত্রে বরাদ্দ হ্রাস — কৃষি ক্ষেত্রে বাজেটে গতবারের বরাদ্দ ছিল ১৮ হাজার ৭৮১ কোটি টাকা। তা এবারে হয়েছে ১১ হাজার ৫৩১ কোটি টাকা। গ্রামীণ উন্নয়নে গতবছর বরাদ্দ ছিল ৫৬ হাজার ৪৩৮ কোটি টাকা। এবারে বরাদ্দ মাত্র ৩ হাজার ৮২ কোটি টাকা। কমেছে ৫৩ হাজার ৩৫৬ কোটি টাকা।

সমাজ কল্যাণমূলক ক্ষেত্রে বরাদ্দ হ্রাস — সামাজিক কল্যাণে গত বছর বরাদ্দ ছিল ৬ লক্ষ ৮০ হাজার ১২৩ কোটি টাকা। এবারে তা কমে হয়েছে ৪ লক্ষ ৮৪ হাজার ৫৩২ কোটি টাকা। প্রায় ২ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ কমানো হয়েছে।

তফসিলি জাতি উপজাতি কল্যাণে বরাদ্দ কমেছে যথাক্রমে ৪৭ হাজার এবং ১৪ হাজার কোটি টাকা। যোজনা কমিশনের নির্দেশিকা অনুসারে তফসিলি জাতি উপজাতি জনসংখ্যা অনুপাতে যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ প্রয়োজন ছিল তা মানা হয়নি। বরং কমানো হয়েছে বরাদ্দ।

এবারের বাজেটে **মহাত্মা গান্ধী ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি স্কিমের (রেগা)** বরাদ্দ ব্যাপক হ্রাস করা হয়েছে। এই খাতে গতবছর বরাদ্দ ছিল ৩৩ হাজার কোটি টাকা। এবছর বরাদ্দ হয়েছে মাত্র ৩৪ হাজার কোটি টাকা। মূদ্রাস্ফীতিতে হিসাবে ধরলে প্রকৃত বরাদ্দ হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া ও গতবছরের মজুরিবাবদ বকেয়া রয়ে গেয়ে ৫ হাজার কোটি টাকা। এর কারণ পূর্ববর্তী অর্থমন্ত্রী আন্তর্জাতিক ফিন্যান্স পুঁজিকে তুষ্ট রাখার তাগিদে আর্থিক ঘাটতি যতটা সম্ভব কম দেখানোর প্রচেষ্টায় মজুরি প্রদান মুলতুবি রেখেছিলেন। অর্থাৎ মূদ্রাস্ফীতিকে হিসাবে না রেখেও এবছর এই ক্ষেত্রে বরাদ্দ হওয়া উচিত ছিল ৪৩ হাজার কোটি টাকা। আর মূদ্রাস্ফীতিকে হিসাবে রাখলে এই প্রকল্পে চলতি আর্থিক বছরে ১৪ হাজার কোটি টাকা বেশি বরাদ্দ করা প্রয়োজন ছিল পূর্বের তুলনায় (৪৭ হাজার কোটি টাকা)। অর্থাৎ এক্ষেত্রে কর্মসংকোচন হবেই, যার পরিণতি হবে ভয়ঙ্কর।

ইন্দিরা আবাস যোজনা প্রকল্পেও বরাদ্দ টাকার মূল্যে হ্রাস পেয়েছে। **সংখ্যালঘু অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পে** গতবারে বরাদ্দ ছিল ৮৩২.৩৩ কোটি টাকা। বামপন্থীদের চাপেই এই প্রকল্প চালু হয়েছিল ইউ পি এ আমলে। ১০২টি জেলায় তা চালু করা হয়েছিল। এতে শুধু সংখ্যালঘুদের নয় ঐ অঞ্চলের সমস্ত মানুষেরই উন্নয়ন হতো। এ বছর ঐ প্রকল্পে একটি টাকাও বরাদ্দ করা হয় নি।

উচ্চশিক্ষা ও উন্নত প্রযুক্তি প্রশিক্ষণে জলপানির যে প্রকল্প ছিল তার অর্থ বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। শুধুমাত্র প্রথাগত কারিগরি প্রশিক্ষণ নয় সংখ্যালঘু যুব সমাজকে উন্নত আধুনিক শিক্ষার মধ্যে টেনে আনা এই প্রকল্পের লক্ষ্য ছিল। বর্তমান বিজেপি সরকারের এই ভাবনাটা নেই।

নারী ও শিশু কল্যাণে গত বছর মোট বাজেটের ১.১ শতাংশ খরচ হয়েছিল। এবারে বরাদ্দ ০.১ শতাংশ। **স্বাস্থ্য** ক্ষেত্রে অনেক প্রতিশ্রুতি থাকলেও কোন নির্দিষ্ট বরাদ্দ নেই। বিনামূল্যে ঔষধ পরিষেবা ও ডায়াগনস্টিক পরিষেবার কথা বলা আছে। কিন্তু বরাদ্দ নেই। ২০১৯ সালের মধ্যে প্রতিটি ঘরে শৌচাগার তৈরীর লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করে ১০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে দিশাহীন — বাজেটে মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে রেখে বৃদ্ধির হার ওপরে তোলার লক্ষ্য ঘোষণা হয়েছে। ৫০০ কোটি টাকার মূল্য স্থিতিকরণ তহবিল ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু জিনিসপত্রের মূল্য নিয়ন্ত্রণে সরকার কি পদক্ষেপ নিতে চলেছে তার কোন দিশা বাজেটে নেই।

আয়করে সামান্য ছাড়, পরোক্ষ করে বৃদ্ধি — আয়করের হার একই থাকছে। তবে আয়কর ছাড়ের সীমা সামান্য বৃদ্ধি করে মধ্যবিত্তদের কিছুটা খুশি করার চেষ্টা হয়েছে। ২ লক্ষ থেকে বেড়ে বার্ষিক আড়াই লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয় করমুক্ত করা হয়েছে। প্রবীণ নাগরিকদের ক্ষেত্রে ছাড়ের সীমা আড়াই লক্ষ টাকা আয় থেকে বৃদ্ধি পেয়ে তিন লক্ষ করা হয়েছে। পাশাপাশি আয়কর আইনের ৮০সি ধারায় বিনিয়োগে কর ছাড়ের সীমা ১ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে দেড় লক্ষ টাকা করা হয়েছে। আয় করের হার অপরিবর্তিত থাকছে। সেটা হল — বার্ষিক আয় আড়াই লক্ষ টাকার পর থেকে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ১০ শতাংশ, ৫ লক্ষ থেকে ১০ লক্ষ পর্যন্ত ২০ শতাংশ, ১০ লক্ষ টাকার উপরে ৩০ শতাংশ হারে। আড়াই লক্ষ টাকা অবধি আয়ে তিন শতাংশ হারে শিক্ষা সেসও মকুব করা হয়েছে। মোটের উপর বার্ষিক আয়ে ৫০ হাজার টাকার বাড়তি ছাড় এবং এই ৫০ হাজার টাকার উপর ৩ শতাংশ শিক্ষা সেস ছাড় দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, করযোগ্য আয়ে শিক্ষা সেস আগের মতই তিন শতাংশ বহাল রাখা হয়েছে।

আয়করের এই সামান্য ছাড় মধ্যবিত্তদের খানিকটা সুরাহা দেবে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু যেভাবে ৭৫২৫ কোটি টাকার অতিরিক্ত পরোক্ষ কর চাপানো হয়েছে, নিশ্চিতভাবেই তার নেতিবাচক প্রভাব পড়বে সাধারণ মানুষের উপর। এছাড়াও অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি বলেছেন এ বছরের শেষের দিকে 'কর সংস্কার' মূলক পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে ছাড় — আয়কর আইনের ৮০সি ধারায় এক লক্ষ থেকে বাড়িয়ে দেড় লক্ষ টাকা পর্যন্ত সঞ্চয়কে করমুক্ত বলে বাজেটে ঘোষণা করা হয়েছে। এই ধারায় আয়ের উপর দেয় করে ছাড় পাওয়া যায় জীববীমা, পাবলিক প্রভিডেন্ড ফান্ড বা পি পি এফ, কর্মচারী প্রভিডেন্ট ফান্ড বা ই পি এফ, মিউচ্যুয়াল ফাণ্ড ও ব্যাঙ্কে ৫ বছর মেয়াদী স্থায়ী আমানতে টাকা জমালে এবং গৃহঋণে সুদের উপর। উল্লেখ্য, এবার অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে প্রাক বাজেট আলোচনার ব্যাঙ্ক ও বীমা ক্ষেত্রের তরফে দেড় লক্ষ টাকা পর্যন্ত সঞ্চয়কে করমুক্ত করার আরজি জানানো হয়েছিল। কারণ গত আর্থিক বছরে পারিবারিক ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের হার জি ডি পি-র ৩০ শতাংশে নেমে এসেছে, যা ২০০৮-০৯-এ ছিল ৩৮ শতাংশ।

এছাড়াও গৃহঋণে দু'লক্ষ টাকা পর্যন্ত সুদ এখন করমুক্ত। আগে ছিল দেড় লক্ষ টাকা।

ভরতুকি ব্যবস্থা তুলে দেওয়ার ইঙ্গিত — বাজেট প্রস্তাবে ভরতুকির হার গতবারের তুলনায় মাত্র ২.৪৭ শতাংশ বৃদ্ধি করে মোট ২ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে)

লোক ঠকানো এবং কর্পোরেটবান্ধব রেল বাজেট

উৎসর্গ মিত্র

রেল মন্ত্রী হিসাবে শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অযোগ্যতার মাশুল গুণতে শুরু করলো আম জনতা। অন্ততঃ মোদী সরকারের প্রথম রেল বাজেট দেখে সেই কথাই মনে হয়! রেল মন্ত্রী হিসাবে শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায় এমন কোনো কীর্তি রেখে আসেননি, যাতে আম জনতার সাথে সরাসরি জড়িত কেন্দ্রীয় সরকারের এই সুবিশাল দপ্তরটি আরও সঠিকভাবে জনগণের সেবায় লাগতে পারে। তিনি বরং তখন ব্যস্ত ছিলেন বিশেষ করে বাংলার মানুষের সামনে নানা প্রকল্পের রঙীন ফানুস ওড়াতে। একটাই মাত্র কাজ তিনি করতেন, আর সেটা হল, রেলের টাকা অপচয় করে যত্রতত্র বাস্তব অবাস্তব নানা প্রকল্পের নাম করে পাথর পুঁতে বেড়ানো। আরও একটা কাজ তিনি করেছিলেন, বাংলার সংস্কৃতি জগতের কিছু তাঁর ঘনিষ্ঠ 'বুদ্ধিজীবী' যাঁদের রেল সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতা নেই, তাঁদের রেলের পয়সায় বড়লোক করে দিয়েছিলেন। নানা কমিটি রেলে তখন। কোনোটার নাম 'যাত্রী পরিষেবা কমিটি', কোনোটার নাম 'রেল হেরিটেজ কমিটি', আবার কোনোটার নাম বা 'যাত্রী সুরক্ষা কমিটি'। কি তাদের কাজ, কেউ জানতো না। শুধু জানতো, এর প্রত্যেকটির মাথায় আছেন এই সব 'বুদ্ধিজীবী (!)'রা যাঁদের বেতন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বিশাল এবং যাঁরা আসলে এই সুবৃহৎ দপ্তরটির সাথে যুক্ত থাকার যোগ্যই নন। আর এই সব করতে গিয়ে তিনি রেলের ভাঁড়ারটিকেই নিঃস্ব করে দিয়ে এক সময়ে সরে পড়েছেন।

সরকারের হিসেব বলছে, সে সময়ে ভাঁওতা দিতে গিয়ে শুধু বাংলার জন্যেই তিনি প্রায় ৭০ হাজার কোটি টাকার ১০০টি প্রকল্প ঘোষণা করে ফেলেছিলেন এবং গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে জাঁকজমক সহকারে সেগুলির 'শিলান্যাস'ও করা হয়েছিল। কোনো কোনো প্রকল্পের দুবার করেও শিলান্যাস হয়েছে। এই সব শিলান্যাসের জন্য কম করে ৪০০ কোটি টাকা গাঁটগচ্চা দিতে হয়েছে রেলকে। রেলের হিসেব অনুযায়ী, প্রতিটি অনুষ্ঠানে খরচ হয়েছে গড়ে ৫০ থেকে ৭০ লক্ষ টাকা। প্রতিটি শিলান্যাসের আগে কলকাতা এবং উত্তরবঙ্গের প্রায় সমস্ত সংবাদপত্র এবং গণমাধ্যমে প্রায় ৩০ কোটি টাকার বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। খাবার প্যাকেট, রিফ্রেশমেন্ট এবং গাড়ি ভাড়া খরচ ২ কোটি টাকার উপর, সঙ্গীত শিল্পী এবং ঘোষক-ঘোষিকার জন্য ব্যয় হয়েছে ১ কোটি টাকা। আর এগুলিই রেলের ভাঁড়ারকে একেবারে নিঃস্ব করে দিয়েছে। দ্বিতীয় ইউ পি এ সরকারের পক্ষে শেষ সময়ে এই ক্ষতি সামাল দেওয়া সম্ভব হয়নি।

উল্লেখ করার বিষয় হল, প্রায় এই সমস্ত খরচই হয়েছে শুধুমাত্র বাংলায় তাঁর কার্যকলাপের জন্য, গোটা দেশের জন্য নয়। আসলে সে সময়ে রাজ্যের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে মাথায় রেখেই তাঁর যাবতীয় কার্যকলাপ আবর্তিত হত। নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে আইন বা নিয়মকানুনের কোনো তোয়াক্কা না করার ফলে সে সময়ে ঘোষণা করা বেশিরভাগ প্রকল্পই দিনের আলোর মুখ দেখেনি। এখন প্রশ্ন, এই কয়েকশো কোটি টাকা, বেহিসেবী খরচের দায়ভার কার? দায়ভার যাঁর, তিনি এ ব্যাপারে মুখ খুলবেন না সেটা জানা কথা, কিন্তু এই ঘটনাবলীকে হাতিয়ার করেই মোদী সরকারের প্রথম রেল বাজেট থেকে ছেঁটে ফেলা হল সেই সময়ে ঘোষিত হওয়া প্রায় সমস্ত প্রকল্প। এখন বাংলার মানুষের বুঝে নেওয়ার সময় এসেছে ভাঁওতার ফলাফল।

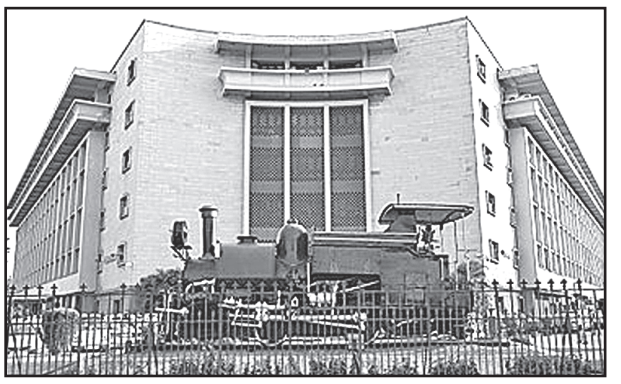

ভারতীয় রেল ভবন

প্রত্যাশা মতই দেশের বর্তমান সরকারের প্রথম রেল বাজেট তৈরী হয়েছে কর্পোরেট মহলের স্বার্থ মাথায় রেখে, আম জনতার কথা মাথায় রেখে নয়। ১৮টি নতুন লাইনে সমীক্ষার কথা বলা হয়েছে বাজেটে। ৫টি জনসাধারণ ট্রেন, ৫টি প্রিমিয়াম ট্রেন, ৬টি এসি এক্সপ্রেস, ২৭টি এক্সপ্রেস এবং ৮টি প্যাসেঞ্জার ট্রেনের ঘোষণাও করা হয়েছে বাজেটে। বাজেটে সুরক্ষিত এবং আরামদায়ক রেল যাত্রার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে জোর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, বলা হয়েছে বুলেট ট্রেন চালানোর কথা, কিন্তু পাশাপাশি রেলের ঘরে পয়সা নেই, এই যুক্তিতে দেদার বেসরকারীকরণের রাস্তাও খুলে দেওয়া হয়েছে এতে। ঘোষণা করা হয়েছে প্রয়োজনে কোনো রকম ঊর্ধ্বসীমা ব্যাতিরেকেই বিদেশী বিনিয়োগকে স্বাগত জানানো হবে। এ ছাড়াও ঘোষণা করা হয়েছে যে প্রতি ছয় মাস অন্তর রেলের যাত্রী ভাড়া এবং পণ্য মাসুল বাড়াবার ব্যবস্থা করা হবে।

রেল বাজেট পেশের মাত্র কিছুদিন আগেই চড়া হারে যাত্রী ভাড়া এবং মাসুল বাড়িয়েছিল সরকার (যথাক্রমে ১৪.২ এবং ৬.৫ শতাংশ হারে)। আশা করা হচ্ছে সেই বাবদ রেলের ঘরে বাড়তি ৮ হাজার কোটি টাকা আসবে আগামী ২০১৪-১৫ আর্থিক বর্ষে। মোট ১,৬৪,৩৭৪ কোটি টাকা আয়ের লক্ষ্য ঘোষণা করা হয়েছে বাজেটে, খরচ ধরা হয়েছে মোট ১,৪৯,১৭৬ কোটি টাকা। অর্থাৎ প্রায় ১৪ হাজার কোটি টাকার উদ্বৃত্ত বাজেট সংসদে পেশ করেছেন রেলমন্ত্রী সদানন্দ গৌড়া। পরিকল্পনা খাতে ৬৪,৪৪৫ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে, এর মধ্যে ৩০ হাজার কোটি টাকা বাজেট সহায়তা এবং ১১,৭৯০ কোটি টাকা বাজার থেকে ঋণ করা হবে বলে জানানো হয়েছে। পিপিপি প্রকল্পে ৬,০০৫ কোটি টাকা আসবে বলে আশা করা হয়েছে। এখানেও আবার শ্রীমতী ব্যানার্জীর কথা চলে আসছে। রেল মন্ত্রী থাকাকালীন এই পি পি পি মডেলের কথা ঘোষণা করেছিলেন তিনি এবং তার বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল রাজ্যের বর্তমান অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্রকে। দু'জনে একাজ বাস্তবায়িত করতে তেমন সক্ষম হননি। কিন্তু রেলের বিপুল সম্পদ বেসরকারী মুনাফার জন্য তুলে দেওয়ার নীতিটি ছাড় পেয়ে গিয়েছিল সংসদে। এবারে নরেন্দ্র মোদীর সরকার সেই নীতিকেই তুলে নিয়ে গেছে আরও এক ধাপ। রেলমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে এর পর থেকে রেলের শুধুমাত্র পরিচালন ক্ষেত্রটি ছাড়া পরিকাঠামোর সব ক্ষেত্রেই বিদেশী বিনিয়োগ টানা হবে। এ সংক্রান্ত প্রস্তাব যাচ্ছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় এবং সেখানে ছাড়পত্র পেলেই রেলে চালু হয়ে যাবে দেদার বিদেশী বিনিয়োগ। পরিস্থিতি যা, তাতে এই ছাড়পত্র পাওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা মাত্র।

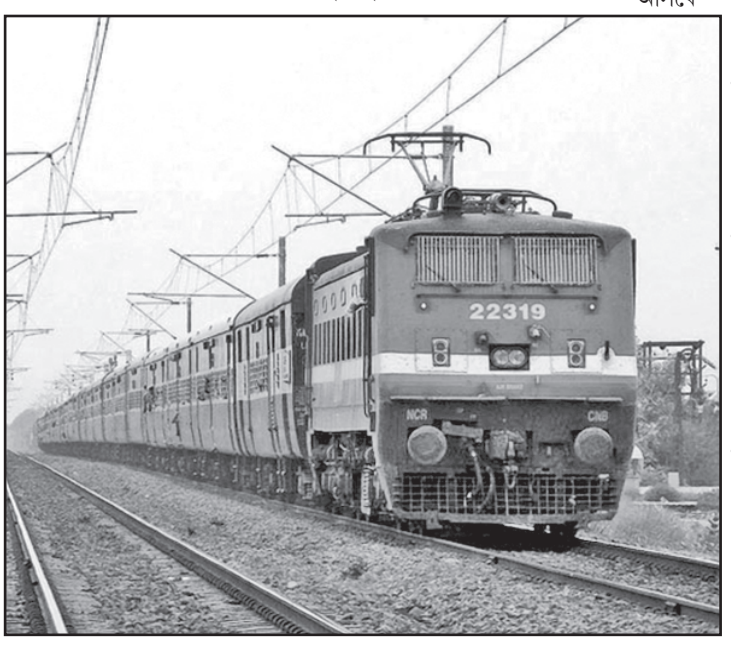

বিদেশী বিনিয়োগ প্রসঙ্গে রেলমন্ত্রী জানিয়েছেন যে, বিশেষ করে বুলেট ট্রেন চালানোর ক্ষেত্রে পরিকাঠামো নির্মাণ বাবদ যে পরিমাণ টাকার প্রয়োজন, সে পরিমাণ টাকার যোগান দেওয়া ভারত সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। একারণেই বিদেশী বিনিয়োগ টানার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, রেলের বর্তমান নীতি অনুযায়ী সেখানে বিদেশী বিনিয়োগ নিষিদ্ধ। সেই জন্য মন্ত্রীর নির্দেশে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার কাছে একটি বিস্তারিত নোট পাঠানো হচ্ছে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় অনুমোদন পাওয়ার জন্য। রেল মন্ত্রকের আরো যুক্তি, শুধুমাত্র পণ্য মাশুল এবং যাত্রী ভাড়া বাড়িয়ে বেশিদিন রেলের সম্পদ বাড়ানো সম্ভব নয়, একারণেই আরো বেশি করে বিদেশী বিনিয়োগ বাড়ানোর দরকার হয়ে পড়েছে। কিন্তু এই যুক্তিতেও ফাঁক থেকে গেছে। যে বিদেশী সংস্থাগুলি এই পরিকাঠামো বাবদ পয়সা ঢালবে, তারা সে কাজ করবে মুনাফা আদায়ের জন্য, মানুষের কল্যাণের জন্য নয়। সুতরাং এই ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষের কিভাবে উপকার হবে, তার কোনো ব্যাখ্যাই দিতে পারেনি রেল মন্ত্রক। আজ যদি রেলের প্ল্যাটফর্মগুলির দায়িত্ব কর্পোরেটদের হাতে তুলে দেওয়া হয়, কিম্বা ফাস্ট ট্র্যাক তৈরির বরাত দেওয়া হয় কোনো বেসরকারী কোম্পানীর হাতে, তাহলে সেই কোম্পানী মুনাফার লক্ষ্যে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে এ বাবদ যেকোনো পরিমাণ অর্থ আদায় করে নিতে পারে, যেমনটা হচ্ছে নানা বিমান বন্দর থেকে। তাহলে এতে সাধারণ মানুষের লাভটা কোথায়?

রেল দুর্ঘটনা এড়াতে বাজেটে 'কারণ অনুসন্ধানী প্রযুক্তি প্রকল্পের' ঘোষণা করা হয়েছে। ওভার ব্রিজ এবং আন্ডার ব্রিজের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ১,৭৮৫ কোটি টাকা। গৌড়ার ঘোষণা, মহিলা সুরক্ষার জন্য নিয়োগ করা হবে ৫ হাজার মহিলা কনস্টেবল। ইন্টারনেটে রিজার্ভেশন পদ্ধতি দ্রুততর করার পাশাপাশি অসংরক্ষিত কামরা এবং প্ল্যাটফর্ম টিকিট কাটার ব্যবস্থা ইন্টারনেটে করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে বাজেটে।

বাজেট বরাদ্দে রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব করার অভিযোগ উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে। মহারাষ্ট্র বিধানসভা ভোটের বিবেচনায় অন্য বহু প্রান্তের তুলনায় অনেক বেশি প্রকল্প ঘোষণা হয়েছে। প্রাদেশিকতার সুস্পষ্ট আভাস আছে এ বাজেটে। মধ্যপ্রদেশ, আসাম, বিহার, অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশা এবং সীমান্ধ্রের প্রতি কোনো নজরই দেওয়া হয়নি, অথচ প্রধানমন্ত্রীর রাজ্যকে দেওয়া হয়েছে মুম্বাই-আমেদাবাদ বুলেট ট্রেন। আবার বাংলার ভাঁড়ারে জুটেছে মাত্র একটি শালিমার-চেন্নাই প্রিমিয়াম বাতানুকুল ট্রেন এবং সাপ্তাহিক পারাদ্বীপ-হাওড়া এক্সপ্রেস! এমনকি বিমানবন্দরের ধাঁচে দেশের যে দশটি রেল স্টেশনকে উন্নীত করা হবে বলে বলা হয়েছে বাজেট বক্তৃতায়, তার মধ্যে বাংলার হাওড়া কিম্বা শিয়ালদা আছে কিনা তাও পরিষ্কার নয়! সাম্প্রদায়িক মনোভাবের আভাস পাওয়া যায় রেল বাজেট থেকে। বলা হয়েছে দেশের বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্রগুলিকে জুড়ে তৈরী হবে বিশেষ ট্রেন রুট। কিন্তু যে রুটগুলির উল্লেখ করা হয়েছে এতে, যেমন 'দেবী সার্কিট', 'জ্যোতির্লিঙ্গ সার্কিট' ইত্যাদি, সেগুলি সবই মূলত হিন্দু তীর্থস্থানগুলির কথা মাথায় রেখে, কিন্তু মুসলিম, শিখ ইত্যাদি অন্য প্রধান ধর্মস্থানগুলির কথা বেমালুম চেপে যাওয়া হয়েছে।

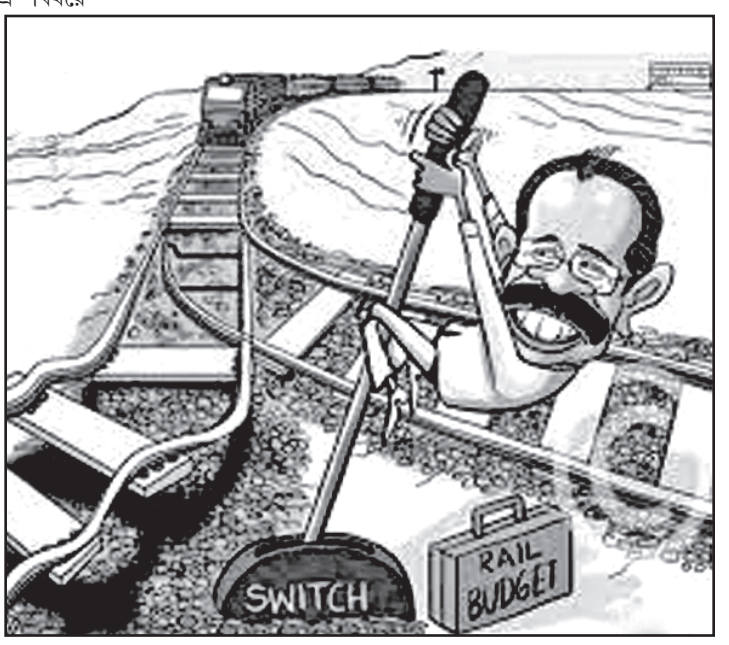

দেশের কর্পোরেট বান্ধব সরকারের এহেন বাজেটে স্বাভাবিকভাবেই খুব খুশি বণিক মহল। তারা একে 'সংস্কারমুখী ও দেশের বৃদ্ধির সহায়ক' বলে বর্ণনা করেছে। এটা তারা করবেই কারণ রেলের বিপুল সম্পত্তির উপর তাদের দীর্ঘদিনের লোভ ছিল। এখন সে সম্পত্তি দখলের রাস্তা খুলে যাওয়ায় তাদের উৎসাহের সীমা থাকবে না, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রশ্ন হল, দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর অনুগামী রেলমন্ত্রীর হাত ধরে রেল যে তার এতদিনের সামাজিক দায়বদ্ধতা ভুলতে বসেছে, তার কি হবে? রেলের উপর সবচেয়ে বেশি নির্ভর করেন সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ। এখন যদি তাদের উপরেই আঘাত নেমে আসে বাড়তি কিছু অর্থ আদায়ের নাম করে, তাহলে তাঁদের প্রতি অবিচারই করা হবে। এর আগে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এফ ডি আই কিম্বা পি পি পি মডেলের অভিজ্ঞতা মোটেই সুখকর নয় সাধারণ মানুষের কাছে। এখন রেলেও সেই নীতি গ্রহণ করলে তার ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম হু হু করে বাড়বে, তা বলাই বাহুল্য, আর তার দায় ভোগ করতে হবে সেই সাধারণ মানুষকেই। ভারতীয় রেলের আর্থিক স্বাস্থ্যের দিকে নজর না দিয়ে বাজেটে আয়-ব্যয়ের হিসেব দেখানো হয়েছে ৯৪ শতাংশ, যা আগে ছিল ৯০ শতাংশ। অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের ব্যাপারটিকে দারুণ ভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে এবার। গত বছরের ঘোষিত ৯৯টি প্রকল্পের মধ্যে মাত্র ১টি বাস্তবায়িত হয়েছে বলে স্বয়ং রেল মন্ত্রী জানিয়েছেন। অথচ এগুলি রূপায়িত হলে রেল তার সামাজিক দায়বদ্ধতা রক্ষা করতে পারতো। এর থেকেই স্পষ্ট যে রেল তার সামাজিক দায়বদ্ধতার থেকে সরে আসছে এবং তার সম্প্রসারণের রাস্তাও ক্রমশ বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। রেলের বহু আলোচিত সুরক্ষা ব্যবস্থা নিয়েও স্পষ্ট কোনো বক্তব্য নেই বাজেটে, অথচ সাধারণ মানুষ চান সর্বাগ্রে সঠিক সময়ে, সুরক্ষিতভাবে রেল যাত্রা সুনিশ্চিত করা হোক। সামগ্রিকভাবে রেলের আর্থিক স্বাস্থ্য এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার উন্নতির ক্ষেত্রে সরকারের দায়িত্ব ভুলে এবারের বাজেটে জোর দেওয়া হয়েছে এফ ডি আই আকৃষ্ট করার পাশাপাশি ঢালাও বেসরকারীকরণের উপর, যা হওয়া উচিত ছিল একেবারে উল্টো। বাজেটে বহু বাগাড়ম্বর করা হলেও বহু ক্ষেত্রে আর্থিক সঙ্গতির ব্যবস্থাই রাখা হয়নি। রেলের ৩ লক্ষ শূন্য পদ পূরণের কোনো ব্যবস্থাই রাখা হয়নি বাজেটে। খুব ঠিক কথা বলেছেন পশ্চিমবঙ্গ থেকে রাজ্যসভায় নির্বাচিত প্রতিনিধি সীতারাম ইয়েচুরি। তাঁর কথায় রেলের এই বাজেট 'প্রসাধনী চমক' ছাড়া আর কিছুই নয়। টেকনোলজির নানা প্রসাধনের আড়ালে রেলের কুৎসিত রূপকে আড়াল করারই ব্যর্থ চেষ্টা করা হয়েছে এই বাজেটে। 'জনবিরোধী' এবং 'লোকঠকানো' ছাড়া সম্ভবত আর কিছুই বলা যাবে না একে!□

১০ সেপ্টেম্বর ২০১৪ পাঁচ দফা দাবিতে

সংগ্রামের মেজাজে পথে নামবে কর্মচারী সমাজ

মনোজ কান্তি গুহ
সাধারণ সম্পাদক, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দেশের নাগরিকগণ সর্বোচ্চ স্থানে অবস্থান করেন। কারণ দেশের নাগরিকদের জন্যই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রণয়ন এবং নাগরিকদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর গণতন্ত্রের চরিত্র নির্ভর করে। আমাদের দেশে স্বাধীনতার পর সংবিধানে যে অধিকারগুলি নাগরিক সমাজকে দেওয়া হয়েছে তারমধ্যে প্রধান একটি উপাদান রাজনৈতিক অধিকার। স্বাধীনতার ৬৭ বছর পরে বলতে হয় একমাত্র দেশের সরকারী কর্মচারীদের রাজনৈতিক অধিকার নেই। অথচ পুঁজিবাদের স্বার্থে নয়াউদারীকরণের নীতি প্রয়োগের জন্য দেশের অর্থনীতি, শিল্পনীতির বুনিয়াদি ব্যবস্থা ভেঙে ফেলে নতুন নতুন আইন প্রণয়ন হচ্ছে যা কিনা অনেক ক্ষেত্রে দেশের সংবিধানকে এবং তার মৌল উপাদানগুলিকে আঘাত করছে। পশ্চিমের সমস্ত উন্নত গণতান্ত্রিক দেশে সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘট করার অধিকার আছে। ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশনের (ILO) সদস্য দেশ ভারতবর্ষ। আই এল ও-র ১৫১, ১৫৪ নং ধারায় সমগ্র দেশে সরকারী কর্মচারীদের সংগঠন করার এবং ধর্মঘটের অধিকার দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। আমাদের দেশ সেই সিদ্ধান্ত অমান্য করে চলেছে। ভারতবর্ষের সংবিধানের ১৯ নম্বর ধারায় বর্ণিত আছে মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং সংঘবদ্ধ হওয়ার অধিকার, দেশের নাগরিকদের ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য। সংবিধানের ১৯ নং ধারার বিষয়গুলিই মূলত ভারতীয় সংবিধানের প্রধান ভিত্তি। ভারতীয় সংবিধানের দ্বিতীয় ভিত্তি হচ্ছে, জীবন, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত অধিকার যা ২০ নং ধারা থেকে ২২ নং ধারা পর্যন্ত বিস্তৃত আছে। এই অধিকারগুলিকে ছয়টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

ক) বাক্ স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের অধিকার (Right to freedom of speech and expression)

খ) শান্তিপূর্ণভাবে এবং নিরস্ত্র হয়ে সমবেত হওয়ার অধিকার (Right to assemble peacefully and without arms)

গ) সমিতি বা ইউনিয়ন সংগঠনের অধিকার (Right to form association and unions)

ঘ) ভারতীয় ভূ-খণ্ডে স্বাধীনভাবে বিচরণ করবার অধিকার (Right to move freely throughout the territory of India)

ঙ) ভারতের যে কোন স্থানে বসবাসের অধিকার (Reside and settle in any part of the territory of India)

চ) আপন ইচ্ছানুযায়ী বৃত্তি ও উপজীবিকা গ্রহণ এবং যে কোন ব্যবসা-বাণিজ্য চালাবার অধিকার (Practise and profession or carry on any occupation, trade or business)

সাথে এটাও বলা আছে যে সংবিধান অনুযায়ী সরকার পরিচালিত হচ্ছে কিনা এবং নাগরিক সমাজের ক্ষেত্রে সংবিধানের অধিকারগুলি রক্ষিত হচ্ছে কিনা এই সবটাই দেখার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে বিচার বিভাগের উপর। কিন্তু দুঃখের হলেও সত্য যে ভারতের বিচার ব্যবস্থা বড় মহার্ঘ এবং দীর্ঘ। গরীব সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার অর্জন খুবই কষ্টসাধ্য। এত খরচ দীর্ঘ সময় ধরে বহন করা অসম্ভব। সেখানে দৈনিক ২০ টাকা খরচ করার ক্ষমতা নেই দেশের জনসংখ্যার ৮৪ কোটি মানুষের, যেখানে প্রতিদিন জীবনধারণ সংসার পালনের জন্য প্রাণপাত করতে হয় কোনমতে বেঁচে থাকার জন্য।

এ ব্যাপারে আমাদের সংগঠনের একটা অভিজ্ঞতা হয়েছে। সেটা হচ্ছে ২০১২ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহীত নব্যউদারীকরণ নীতির বিরুদ্ধে সারা ভারতের ১১টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন (CITU, AITUC, INTUC, BMS, UTUC, TUCC ও অন্যান্য) এবং সর্বভারতীয় ফেডারেশনগুলির আহ্বানে ধর্মঘট ডাকা হয়েছিল। তাতে ভারতবর্ষের ১০ কোটি শ্রমিক, কর্মচারী, মেহনতী মানুষ অংশ গ্রহণ করেছিলেন। আমাদের রাজ্যের ক্ষেত্রে বর্তমান শাসকদল ধর্মঘট ভাঙ্গার চেষ্টা করেছিল সেক্ষেত্রে অনেক অপ্রীতিকর ঘটনা ও রক্ত ঝরেছে আমাদের কর্মচারীদের। সাথে সাথে প্রশাসন থেকে নানা হুমকির ঘটনা এমনকি মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর 'ব্রেক অব সার্ভিস'-এর ঘোষণা অবিদিত নয়। পরবর্তীতে প্রশাসনে অনুপস্থিত কর্মচারীদের একদিনের বেতন কেটে নেয় এবং ডায়াস-নন করে ফলে কর্মচারীদের চাকরি জীবন থেকে একদিন কেটে নেওয়া হয়। অর্থাৎ শাসকশ্রেণীর আক্রোশে একটা ঘটনার জন্য দুটি শাস্তি কর্মচারীরা পেলেন। আমরা রাজ্য সরকারের দমনমূলক আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছি এবং বলেছি ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে মাইনে কাটা সরকারের শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করে। যেমন বামফ্রন্ট সরকার ধর্মঘট করলে বেতন কাটত না, ডায়াস-নন তো তাদের ভাবনার মধ্যেই ছিল না। সে যে সংগঠনই হোক না কেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি, ফেডারেশনসহ সব সংগঠনেরই এই অধিকার ছিল। তৎকালীন সরকার মনে করতেন এটা কর্মচারীদের গণতান্ত্রিক অধিকার। এক্ষেত্রে আমাদের জোরালো বক্তব্য ছিল ছুটি থাকলে ডায়াস-নন করা যায় না। সেই দাবী নিয়েই 'স্যাট'-এর দ্বারস্থ হয়েছিলাম। বিজয় সিন্‌হা বনাম স্টেট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, কেসটি আমরা দাখিল করি ফেব্রুয়ারি ২০১৩-তে এবং আরেকটি কেস 'প্রভঞ্জন ঘোষ বনাম স্টেট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল' দাখিল করি জুলাই-২০১৩-তে। আজ পর্যন্ত ৮টি কেসের দিন ধার্য হয়েছে প্রকৃত অর্থে এখন অবধি কোন শুনানি হয়নি। কারণ কোর্টের এজলাস পরিবর্তন, মাননীয় বিচারক সমর ঘোষ মহাশয় (পূর্বে যেহেতু রাজ্যের মুখ্যসচিব ছিলেন এবং এই ঘটনা তাঁর সময়ে) কেস শুনতে রাজী হননি। বিচারক পরিবর্তন এবং সরকারী উকিল উপস্থিত হয়ে সরকারী বক্তব্য না জানানোর জন্য কেসের শুনানি পিছিয়েছে। এইভাবে আমাদের কেসটি বিলম্বিত হচ্ছে। ইতিমধ্যে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির লক্ষাধিক টাকা ব্যয় হয়ে

গেছে। পশ্চিমবঙ্গে আজ সরকারী কর্মচারীরা নির্যাতিত, আক্রান্ত, রক্তাক্ত, রাজ্যের সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে আমরা বলতে চাই সরকারী প্রশাসনে রাজ্যের গণতন্ত্র রক্ষার সর্বোচ্চ পদাধিকারী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ২২ ফেব্রুয়ারি'২০১৪ নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে তাঁর অনুগামী সরকারী কর্মচারীদের সভায় প্রকাশ্যে আহ্বান জানিয়েছেন 'রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি' ভেঙ্গে দিন। সেদিন রাজ্যের সমস্ত প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেকট্রনিক মিডিয়া এটা প্রচার করেছে। ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী একটি গণতান্ত্রিক দেশে এটা সম্ভব কিনা এই প্রসঙ্গে রাষ্ট্রের নিরপেক্ষ সংস্থাগুলি সেদিন একটা বাক্যও ব্যয় করে নি। বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলি, কংগ্রেস সহ অন্যান্য দলগুলি এই বক্তব্যর বিরোধিতা করেছিল। কিন্তু রাজ্য প্রশাসনে শাসকদলের অনুগামী কর্মচারী সংগঠন, বৃহৎ -মাঝারী-আমলাকুল এবং সরাসরি মন্ত্রী মহোদয়গণ কো-অর্ডিনেশন কমিটি ভাঙ্গার কাজে নেমে পড়লেন। শুরু হল অন্যায়, নীতিহীন, দমনমূলক বদলী। কোন নিয়মনীতি নয়, বেছে বেছে আমাদের সংগঠনের নেতা, কর্মী এবং কর্মচারীদের ব্যাপকভাবে বদলী করা হচ্ছে। শুধু তাই নয় প্রশাসনের অভ্যন্তরে প্রতিনিয়ত আমলাতন্ত্র এবং শাসকদলের অনুগামীদের হুমকি চলছে। মিটিং, স্কোয়াড সভা করা প্রায় নিষিদ্ধ। এমনকি রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নাম শুনলে কোন সরকারী 'হল' আমাদের ভাড়া দেওয়া হচ্ছে না। জরিমানা আদায়, মিথ্যা মামলায় কর্মচারীদের জড়িয়ে দিয়ে কর্মচারীদের ব্যাপক অর্থনৈতিক ক্ষতি করা হচ্ছে। প্রশাসনে গণতান্ত্রিক এবং ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। সরকারী আদেশ জারী করে সভা-সমিতি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আজ পর্যন্ত নানা বিষয়ে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীকে বহু চিঠি দেওয়া হয়েছে এবং সাক্ষাৎকার চেয়ে বেশ কয়েকটি পত্র আমরা দিয়েছি কিন্তু সরকার অনড়। অথচ এই সরকারই ২০১১ সালের ২০ মে শপথ নিয়ে ২৩ মে সংগঠনগুলিকে ডেকে সভা করে অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। তিনমাস অন্তর কর্মচারী সংগঠনগুলির সাথে বসা হবে বলে ঘোষণা করেছিলেন। প্রকৃত অর্থে মাত্র ২টি সভা হয়েছে আরেকটি সভায় শুধু মহার্ঘভাতা ঘোষণা করেছেন। তারপর থেকে আর সভা হয়নি। এককথায় বলতে গেলে পশ্চিমবঙ্গে চলছে অ-ঘোষিত জরুরী অবস্থা। আরেকদিকে কর্মচারীদের প্রতি চলছে অর্থনৈতিক বঞ্চনা। ওপরের আমলাতন্ত্রের প্রতি কোন অর্থনৈতিক বঞ্চনা নেই। কারণ তাঁরা সবাই ১০০ শতাংশ মহার্ঘভাতা পান। পুজোর আগে কোট-প্যান্ট-শাড়ী উপহার পান। তাঁদের কারো কারো মাইনে একলাখ টাকা অতিক্রম করেছে। সাথে বাংলো, গাড়ীসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা। অথচ অধীনস্থ তাঁদের কর্মচারী এই ভয়াবহ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বাজারে কিভাবে দিন যাপন করছে একবারও খবর নেন না। সত্তর দশকের আমলাতন্ত্র আমরা দেখেছি, তাঁদের আইনমেনে প্রশাসন চালানোর দক্ষতা ও সাহস দেখেছি। অনেক সময় মন্ত্রিসভার সাথে মতপার্থক্য হয়েছে। আমাদের দেশের গণতান্ত্রিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা আমলা নির্ভর এবং তার নীচে আছে কর্মচারী সমাজ। যত বিধি মানতে হবে কর্মচারী সমাজকে, কিন্তু বর্তমানে বৃহৎ আমলারা প্রশাসনিক নামে সরাসরি রাজনৈতিক সভামঞ্চে উপস্থিত থাকছেন। হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতিদের ঘোষিত অপরাধী ব্যক্তিদের সাথে একমঞ্চে উপস্থিত থাকছেন, পুলিশ কর্তারাও বাদ যাচ্ছেন না। এর কোনটাই সংবিধানসম্মত কিনা জানা নেই।

রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের সর্ববৃহৎ সংগ্রামী ঐতিহ্যবাহী সংগঠন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি এই সমস্ত আক্রমণ, দমননীতি, অর্থনৈতিক বঞ্চনার বিরুদ্ধে সংগ্রামরত রয়েছে। এই লড়াইতে আমাদের বহু নেতা, কর্মী এবং কর্মচারীদের অনেক কষ্ট, যন্ত্রণা, নির্যাতন সইতে হচ্ছে। এমনকি তাঁদের পরিবারকে নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। বদলীজনিত কারণে কারো কারো পারিবারিক স্থিতিশীলতা বিঘ্নিত হয়েছে। আত্মত্যাগ ছাড়া শ্রেণী সংগ্রাম হয়না। সাহসী, আত্মত্যাগী বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে জয় ছিনিয়ে আনতে হয়। ঘরের চারিদিকে আগুন লাগলে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে থাকলে রেহাই পাওয়া যায় না, আগুন নেভানোর কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। তেমনি বর্তমানে আমাদের বদলীর ভয়কে জয় করতে হবে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে আন্দোলন সংগ্রাম ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। তাই বিগত ৫-৬ জুলাই অনুষ্ঠিত রাজ্য কাউন্সিল সভা থেকে পাঁচ দফা দাবির ভিত্তিতে রাজ্যজুড়ে আন্দোলন সংগ্রামের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। আগামী ১০ সেপ্টেম্বর ৫ দফা দাবিতে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় বিক্ষোভ সমাবেশ এবং মুখ্যমন্ত্রীর নিকট দাবি পত্র পেশ করা হবে। দক্ষিণবঙ্গের কর্মচারীদের নিয়ে কলকাতায় রানী রাসমণি এ্যাভিনিউতে বেলা ৩টার সময় কেন্দ্রীয় বিক্ষোভ সভা হবে এবং উত্তরবঙ্গের কর্মচারীদের নিয়ে শিলিগুড়িতে বাঘাযতীন পার্কে সভা হবে। দাবিগুলি হচ্ছে;

ক) নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং সর্বজনীন গণবণ্টন ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

খ) বকেয়া ৪২ শতাংশ মহার্ঘভাতা অবিলম্বে প্রদান করতে হবে। রাজ্য সরকার অধিগৃহীত বোর্ড কর্পোরেশন, পঞ্চায়েত, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীসহ অন্যান্য বিধিবদ্ধ সংস্থাসমূহের আর্থিক দায়-দায়িত্ব রাজ্য সরকারকে নিতে হবে। পঞ্চম বেতন কমিশনের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অংশের (অমিতাভ চ্যাটার্জী কমিটি) কর্মচারী স্বার্থবাহী সুপারিশসমূহ অবিলম্বে কার্যকরী করতে হবে।

গ) প্রশাসনিক সন্ত্রাস ও দমন-পীড়ণমূলক বদলী বন্ধ করতে হবে।

ঙ) প্রশাসনের সর্বস্তরে শূন্যপদগুলি পি এস সি-র মাধ্যমে পূরণ করতে হবে এবং অনিয়মিত/চুক্তিপ্রথায় নিয়োজিত কর্মচারীদের নিয়মিতকরণ সাপেক্ষে স্থায়ী কর্মচারীদের ন্যায় অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দিতে হবে। ওয়ার্কচার্জড কর্মচারীদের পূর্বের ন্যায় নিয়মিতকরণ করতে হবে। মৃত কর্মচারীদের পোষ্যের চাকরী প্রদানের পূর্ববর্তী ব্যবস্থা বহাল রাখতে হবে।

চ) অবিলম্বে ষষ্ঠ বেতন কমিশন গঠন এবং কমিশনের সুপারিশ ১ জানুয়ারি ২০১৪ থেকে চালু করতে হবে।

সারা দেশজুড়ে নব্য উদারীকরণের নীতি প্রয়োগের ফলে বিগত কয়েক বছর ধরে খাদ্যপণ্যসহ অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম আকাশছোঁয়া হয়েছে। ফলে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের বেতনের ক্ষয়জনিত কারণে তীব্রভাবে ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, খাদ্য, পরিবহন, বিদ্যুৎ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধিতে পরিবার নিয়ে স্বাভাবিক জীবন যাপন অসহনীয় হয়ে উঠেছে। অথচ মহার্ঘভাতার ন্যায্য দাবি আমাদের রাজ্যে অস্বীকৃত। এককথায় সর্বস্তরের কর্মচারীদের বেতন মানের স্তর কমবেশী মোট বেতনের এক তৃতীয়াংশ হ্রাস পেয়েছে। ভারতবর্ষের বড় এবং মাঝারি রাজ্যগুলিতে কর্মচারীরা ৯০ শতাংশ থেকে ১০০ শতাংশ মহার্ঘভাতা পাচ্ছেন। সেখানে পশ্চিমবঙ্গের কর্মচারী সমাজ মাত্র ৫৮ শতাংশ মহার্ঘভাতা পান। আমাদের প্রতিবেশী রাজ্যগুলি যথা বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড, আসাম সহ অন্যান্য রাজ্যগুলি ১০০ শতাংশ মহার্ঘভাতা অর্জন করেছেন। এই তীব্র অর্থনৈতিক বঞ্চনার বিরুদ্ধে আগামী ১০ সেপ্টেম্বর বিক্ষোভ সমাবেশ এবং মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবিপত্র পেশের কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে। এছাড়া পঞ্চম বেতন কমিশনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশের সুপারিশ সমূহ বর্তমান রাজ্য সরকারের কাছে জমা থাকা সত্ত্বেও কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করছে না। সুপারিশগুলিকে ঠাণ্ডা ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই সুপারিশগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি ক্যাডারের স্কেল পরিবর্তন, প্রমোশনের সুযোগ, লীভ ট্রাভেল কন্‌সেশন, টেকনিক্যাল কর্মচারীদের স্কেলের অসংগতি দূরীভূত করা সহ কর্মচারী স্বার্থে আরও বহুবিধ সুযোগ সুবিধার সুপারিশ রয়েছে যা থেকে কর্মচারীরা বঞ্চিত হচ্ছেন। ওয়ার্ক চার্জড কর্মচারীদের ১০ বছর চাকুরীকাল পূর্ণ হলে স্থায়ীকরণের যে আদেশনামা ছিল তার পরিবর্তন করে ঐ অংশের কর্মচারীদের স্থায়ীকরণের অধিকার হরণ করার অপচেষ্টা চলছে। মৃত কর্মচারীদের পোষ্যের চাকুরী প্রায় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। রাজ্যজুড়ে হাজার হাজার আর্থিকদিক থেকে দুর্বল কর্মচারী পরিবারের চাকুরীর আবেদনপত্র পড়ে রয়েছে। পরিবারগুলির সদস্যরা প্রতিনিয়ত দপ্তরে দপ্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। নানাভাবে তাঁদের হয়রানি করা হচ্ছে। প্রশাসনের এক অংশের কর্মচারী ও আমলাতন্ত্র এর সাথে যুক্ত রয়েছে। সমিতিগুলিকে এই অংশের পরিবারগুলির সাথে যোগাযোগ করতে হবে এবং তাঁদের ন্যায্য দাবি আদায়ের সংগ্রামে হাজির করতে হবে। বর্তমান প্রশাসনের অমানবিকতার চেহারা তাঁদের কাছে তুলে ধরতে হবে।

বর্তমান রাজ্য প্রশাসনের শূন্যপদের সংখ্যা ১ লক্ষেরও বেশি(এর মধ্যে শিক্ষক, বোর্ড কর্পোরেশনসহ অন্যান্য ক্ষেত্র ধরা নেই)। স্থায়ী পদগুলিতে কোন নিয়োগ হচ্ছে না। পি এস সি'র মতো একটা গুরুত্বপূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকার প্রাপ্ত সংস্থাকে অকার্যকর করে রেখে প্রায় অবলুপ্তির ষড়যন্ত্র চলছে। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির দীর্ঘদিনের দাবি সমস্ত শূন্যপদ পি এস সি'র মাধ্যমে পূরণ করতে হবে। যা পরবর্তীতে বামফ্রন্ট সরকার স্বীকৃতি দিয়েছিল। বর্তমানে প্রশাসনে শূণ্যপদ পূরণে দুটি পথ গ্রহণ করা হয়েছে। এক, অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের পুনর্নিয়োগ এবং দুই, চুক্তি প্রথায় নিয়োগ। এই দুই ক্ষেত্রে চাকরি পেতে হলে আবার শাসকদলের অনুগামী হওয়া চাই। তাতেও নানা ধরণের অনিয়ম চলছে। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি বেকার যুবক-যুবতীদের ভাত মারা পুনর্নিয়োগের বিরোধী। পুনর্নিযুক্ত কর্মচারীদের অনেকক্ষেত্রে Status down করা হচ্ছে অর্থাৎ তারা অবসরের পূর্বে যেপদে কাজ করতেন তার নীচের পদে কমবেতনে নিয়োজিত হচ্ছেন। আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে কর্মচারীদের একটা ক্ষুদ্রঅংশ অপমানজনক শর্ত মেনে নিয়ে কাজে যুক্ত হচ্ছে। অপরদিকে চুক্তিপ্রথায় শিক্ষিত, উচ্চশিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীদের স্বল্প বেতনে নিয়োজিত করে ক্রীতদাসের মতো ব্যবহার করা হচ্ছে। এই চুক্তি প্রথার কর্মচারীদের কোন চাকুরীগত নিরাপত্তা নেই, কাজের ঘণ্টার কোন নিয়ম মানা হয় না। আমলাতন্ত্রের মর্জির উপর এঁদের সবকিছু নির্ভর করে। ছুটির দিনেও প্রশাসনের নির্দ্দেশে কাজ করতে হয়। ছুটির কোনও অধিকার নেই। কোন কোন ক্ষেত্রে এধরণের

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমে)

চিদাম্বরম এক্সপ্রেসে সওয়ার

(তৃতীয় পৃষ্ঠার পর)

বরাদ্দ করা হয়েছে ২০১৪-১৫ সালের জন্য। ২০১৩-১৪ সালের সংশোধিত হিসাব অনুসারে যা ছিল ২.৪৫ কোটি টাকা। তবে জেটলি জানিয়েছেন সমস্ত ভরতুকি ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করা হবে। তিনি বলেছেন, একে অনেক বেশি লক্ষ্যমাত্রা ভিত্তিক করে তোলা হবে যাতে প্রান্তিক গরীব মানুষ, তফসিলি জাতি ও আদিবাসীর মানুষদের আরও বেশী সুরক্ষা দেওয়া যায়। আসলে এই মিথ্যা প্রতিশ্রুতির আড়ালে যে কঠোর সত্যটা লুকিয়ে আছে তা হলো, গরীব খেটে খাওয়া মানুষদের উপর থেকে ভরতুকি তুলে নিয়ে কর্পোরেট শিল্পপতিদের জন্য রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে আরও খয়রাতির ব্যবস্থা করা হবে। এটাই চাইছে বণিক মহল এবং নয়া উদারনীতির পক্ষে সওয়ালকারী বিশিষ্টজনেরা। একই কারণে নতুন ইউরিয়া নীতিরও ঘোষণা করা হয়েছে।

জ্বালানিতে ভরতুকি কমানোর কথাই ঘোষণা করেছেন জেটলি। ২০১৩-১৪ সালের সংশোধিত হিসাবে যে ভরতুকির পরিমাণ ছিল ৮৫ হাজার ৪৮০ কোটি টাকা, তা ২০১৪-১৫ সালের বাজেট প্রস্তাবে কমিয়ে ৬৩ হাজার ৪২৭ কোটি টাকা করা হয়েছে। অর্থাৎ ভরতুকির পরিমাণ কমছে ২২ হাজার কোটি টাকার মতো। ভরতুকি কমানোর অর্থ হলো এই বোঝা চাপবে সাধারণ মানুষের ঘাড়েই। অর্থাৎ পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন, রান্নার গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি অবধারিত।

খাদ্যপণ্যে ভরতুকি কমানোর ইঙ্গিতের মধ্য দিয়ে খাদ্য সুরক্ষা আইনের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়ল। এই প্রসঙ্গে বাজেটে কোন কথা নেই। বিগত ইউ পি এ সরকার খাদ্যে ভরতুকির পরিমাণ ধার্য করেছিল ১ লক্ষ ১৫ হাজার কোটি টাকা (এবারও তাই রাখা হয়েছে)। এর মধ্যে জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইন প্রণয়ন খাতে বরাদ্দ করা হয়েছিল ৮৮ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। গত ফেব্রুয়ারি মাসে পেশ করা অন্তবর্তী বাজেটেও ভরতুকির পরিমাণ একই রাখা হয়েছিল। বাজেটে খাদ্য সুরক্ষা আইনের মেয়াদ বাড়িয়ে চলতি বছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত করা হয়েছে। মোদি সরকারের যা মতিগতি তাতে এই আইন গভীর সঙ্কটের মুখে। এছাড়াও গণবন্টন ব্যবস্থা সংস্কারের কথাও বলা হয়েছে বাজেটে।

বাজেটে সর্বাধিক ভরতুকি বাবদ বরাদ্দ ধরা হয়েছে **সারে**। অন্তবর্তীকালীন বাজেটে কিন্তু এই পরিমাণ ছিল ৬৮ হাজার কোটি টাকা। এই বাজেটে তা হয়েছে ৭৩ হাজার কোটি টাকা। আমদানি করা ইউরিয়ায় ১২ হাজার ৩০০ কোটি টাকা, দেশীয় ইউরিয়ায় ৩৬ হাজার কোটি টাকা এবং বিনিয়ন্ত্রিত সারে ২৪ হাজার ৬৭০ কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক স্তরে সারের দামবৃদ্ধির সঙ্গে সমতা রেখে এই বৃদ্ধি সামান্যই। সরকার সারে পুষ্টি উপাদানভিত্তিক ভরতুকি ব্যবস্থা বাতিল এবং বিনিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহারের বদলে নতুন ইউরিয়া নীতি প্রণয়নের কথা ঘোষণা করেছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, এর ফলে ইউরিয়ার মূল্য আগামীদিনে বৃদ্ধি পাবে।

পুরানো বাৎসরিক লেনদেনে কর ('রেট্রোস্পেটিভ ট্যাক্স' বা ভোডাফোন কর বলেও পরিচিত) একেবারে বাতিল না করে বলা হয়েছে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে বিষয়টি দেখা হবে যাতে বিনিয়োগের পরিবেশ ব্যাহত না হয়।

নয়া উদারনীতির সঞ্জিবনী তিন টোটকা এফ ডি আই, বিলগ্নীকরণ, পি পি পি — বাজেট প্রস্তাবে **বীমা ও প্রতিরক্ষা** ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগের উর্ধ্বসীমা ২৬ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৪৯ শতাংশ করা হয়েছে। প্রতিরক্ষায় বিদেশী বিনিয়োগের পক্ষে অর্থমন্ত্রীর যুক্তি, বিদেশ থেকে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম আমদানীর জন্য বিদেশী মুদ্রা খরচ কমানো। বিদেশী বিনিয়োগের দ্বারা ভারত এই উৎপাদনে স্বনির্ভর হতে পারে। উল্লেখ্য, এখন প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে উৎপাদনে ২৬ শতাংশ এফ ডি আই-এর সীমা চালু আছে। ২০০১ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত তার সাথে যুক্ত হয়েছে বিদেশী পোর্টফোলিও বিনিয়োগে ২৩ শতাংশ উর্ধ্বসীমা। এতদ্‌সত্ত্বেও এই দীর্ঘসময়ে মাত্র ৫০ লক্ষ মার্কিন ডলার বিনিয়োগ এসেছে। লাফিয়ে বেড়েছে অস্ত্র এবং সরঞ্জাম আমদানি। ভারত এই সময়েই বিশ্বে অস্ত্র আমদানিতে এক নম্বর হয়েছে। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে এফ ডি আই-র প্রবেশ ঘটলে দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে। সে বিষয়েও ভ্রুক্ষেপহীন নয়া উদারনীতির তল্পিবাহক কংগ্রেস বা বিজেপি।

বীমাক্ষেত্রেও আরও বেশী বিদেশী বিনিয়োগ আসুক এটাই চাইছে বর্তমান সরকার। এই বিনিয়োগের ফলে ভারতীয় অংশীদাররা বিদেশী বিনিয়োগকারীদের পুঁজি পাবে বলে বলা হচ্ছে। আসলে উন্নত দেশগুলিতে বীমা ব্যবসায় লাটে উঠে যাওয়া সংস্থাগুলিকে ভারতের বাজারে প্রবেশের সুযোগ করে দেওয়ার জন্যই এই প্রচেষ্টা। নয়া উদারনীতির প্রবক্তারা দুটি ক্ষেত্রেই ন্যূনতম ৫১ শতাংশ এফ ডি আই-র পক্ষে।

বিলগ্নীর ক্ষেত্রে বাজেটে প্রস্তাব রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের শেয়ার বিক্রি করে তোলা হবে ৪৩ হাজার ৪২৫ কোটি টাকা। আগে সরকারী মালিকানাধীনে থাকা হিন্দুস্থান জিঙ্ক এবং বালকোর মতো সংস্থার অবশিষ্ট সরকারী শেয়ার বিক্রি করে আসবে আরো ১৫ হাজার কোটি টাকা। কোল ইন্ডিয়ার ১০ শতাংশ, সেল-র ৫ শতাংশ, ও এন জি সি-র ৫ শতাংশ শেয়ার বিক্রির দিকে অনেকটাই এগিয়েছে সরকার।

রেল বাজেটের মতো সাধারণ বাজেটেও পি পি পি মডেল ছড়িয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। পি পি পি মডেল ছড়িয়ে দিতে 'থ্রি পি ইন্ডিয়া'-র ঘোষণা করেছেন জেটলি। এই সংস্থার পরিচালনায় থাকবে ৫০০ কোটি টাকার তহবিল। জেটলির কথায় ভারতই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় 'পি পি পি বাজার'। এই মডেলে চালু রয়েছে প্রায় নয়শোটি প্রকল্প। চুক্তির পদ্ধতি নমনীয় করার কথা বলা হয়েছে। পরিকাঠামো ক্ষেত্রে পি পি পি মডেলের জন্য পরিকাঠামো বিনিয়োগ ট্রাস্ট তৈরী হবে। বেসরকারী সংস্থাগুলিকে যথেষ্ট ঋণ দেওয়ার নির্দেশও অর্থমন্ত্রী দিয়েছেন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিকে। পি পি পি মডেল দেশে নতুন নয়। এই মডেলে চালু ১১টি কেন্দ্রীয় প্রকল্প ঝুলে রয়েছে। খরচ বেড়ে ১.৫৭ লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। এতদসত্ত্বেও দেশী বিদেশী কর্পোরেট লবিকে তুষ্ট করতেই পি পি পি-তে ভরসা রেখেছেন মোদী-জেটলি। কিন্তু বর্তমানে আর্থিক মন্দার কারণে এই পদক্ষেপ আদৌ সফল হবে কি না তা নিয়ে কর্পোরেট মহলই দ্বিধাবিভক্ত।

অন্যান্য কিছু বিষয় — নারী কল্যাণে ১০০ কোটি, মূর্তি নির্মাণে ২০০ কোটি —

নারী কল্যাণ, মাদ্রাসা উন্নয়ন, আদিবাসী উন্নয়ন সহ ২৮টি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের প্রতিটিতে মাত্র ১০০ কোটি টাকা করে বরাদ্দ করা হয়েছে। অন্যদিকে গুজরাটের বিজেপি সরকারের 'স্ট্যাচু অব ইউনিটি', প্রকল্পে সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের ১৮২ মিটার উচ্চতার মূর্তি তৈরীর জন্য কেন্দ্রীয় বাজেট থেকে ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত এই মূর্তি প্রস্তুতিকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে বিতর্ক শুরু হয়েছে। ২০০০০ বর্গমিটার এলাকাজুড়ে, ২৫০০ কোটি টাকার এই মূর্তি নর্মদা নদীর মাঝে এক দ্বীপে তৈরী হবে বিশ্বের সর্বোচ্চ এই স্ট্যাচু। এই মূর্তি বানানোর কাজ শুরুর জন্য কেবাদিয়া কলোনির ৭০টির বেশি গ্রামের আদিবাসী মানুষকে উৎখাত হতে হয়েছে।

আর্থিক ঘাটতির লক্ষ্যমাত্রা চলতি আর্থিক বছরে রাখা হয়েছে জি ডি পি-র ৪.১ শতাংশ। পরের বছরের লক্ষ্যমাত্রা ৩.৬ শতাংশ। কোষাগারীয় ঘাটতি অর্থাৎ ব্যয় ও রাজস্ব আয়ের ফারাক ২০১৪-১৫ সালে ধরা হয়েছে ৫ লক্ষ ৩১ হাজার ১৭৭ কোটি টাকা, যা বিগত বছরের তুলনায় (ছিল ৫ লক্ষ ২৪ হাজার ৫৩৯ কোটি টাকা) বেশী।

মন্ত্রীদের বেতন বৃদ্ধি — পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেস সরকার ক্ষমতাসীন হয়েই যেভাবে মন্ত্রীদের বেতনভাতা বৃদ্ধি করেছিলেন, কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন হয়েই মোদী সরকার তার প্রথম বাজেটেই সেই পথ অনুসরণ করেছে। বাজেটে ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের বেতন বাবদ বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়ে ৫.৮০ কোটি টাকা হয়েছে (গতবার ছিল ৫.৭৫ কোটি টাকা)। সফর জনিত ব্যয় বাবদ বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়ে ২৭১.৮০ কোটি টাকা হয়েছে (গতবার ছিল ২৬০.২৫ কোটি টাকা)। পি এম ও অফিস সংক্রান্ত খরচ একলাফে বৃদ্ধি করা হয়েছে ৬০ কোটি টাকা।

ঋণ নেবার লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধি — চলতি আর্থিক বছরে ঋণ নেবার লক্ষমাত্রা ৬ লক্ষ কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছে। গত আর্থিক বছরের তুলনায় ৩৭ হাজার কোটি টাকা বেশী। অর্থমন্ত্রী বলেছেন এই ঋণের একটা অংশ যাবে সুদ সহ অতীতের ধার মেটাতে, অপর একটা অংশ সরকারের হাতে থাকবে রাজস্ব ঘাটতি সামাল দেওয়ার জন্য। যেটা অর্থমন্ত্রী বলেন নি সেটা হল এই ঋণের বোঝা চাপানো হবে সাধারণ মানুষের ঘাড়েই।

'নমামি গঙ্গা' নামে গঙ্গা সংরক্ষণ উদ্যোগ চালু করা হবে। বরাদ্দ ২০০০ কোটি টাকা।

হাতে রইল এক — কেন্দ্রীয় সাধারণ বাজেটে পশ্চিমবঙ্গের জন্য নির্দিষ্টভাবে একটি ঘোষণা রয়েছে। বাজেটে সত্যজিৎ রায় ফিল্ম ইন্সটিটিউটকে জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও অন্ধ্রপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ এই চার রাজ্যে এইমস্-এর ধাঁচে একটি করে হাসপাতাল গড়ার কথাও হয়েছে। কিন্তু এই বাবদ বরাদ্দ করা হয়েছে মাত্র ৫০০ কোটি টাকা। এই টাকায় গোটা হাসপাতাল দূরের কথা, পাঁচিলও তৈরি হবে না।

উপসংহার ঃ সরকারে আসার ৪৫ দিনের মধ্যেই সাধারণ মানুষ ''আচ্ছে দিন'' টের পেতে শুরু করেছেন। কিন্তু শাসক দলও জানে যে উদারনীতির ঘোড়া চাইলেই টগবগিয়ে ছোটানো যাবে না। এ দেশের শ্রমিক-কর্মচারী-মেহনতী মানুষ এর বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম করছে দীর্ঘ আড়াই দশক ধরে। তাই নতুন সরকার প্রথম বাজেটে কিছুটা সাবধানী হতে বাধ্য হয়েছে বলা চলে। কিন্তু একই সাথে সাধারণ মানুষকে আন্দোলন বিমুখ করার জন্য কিছু প্রসাধনীও বাজেটে রাখা হয়েছে। 'নিও - মিড্‌ল্‌ক্লাস' বা নব্য মধ্যবিত্তদের জন্য নানা প্রকল্প ও ছাড় সেই উদ্দেশ্যেই। বিজেপি এবারের নির্বাচনে এদের একটা বড় অংশের সমর্থন পেয়েছে। তাই বাজেট বক্তব্যের মধ্যে জেটলি 'নিও-মিড্‌ল্‌ক্লাস' শব্দটি পাঁচবার উচ্চারণ করেছেন। মধ্যবিত্ত অংশ যারা মতামত তৈরী করে তাদের সরকারের পক্ষে রাখার জন্য কৌশল সাধারণ বাজেটের মধ্য দিয়ে নেওয়া হয়েছে। আয়করের ছাড়, সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে ছাড়, হেলথ্‌কেয়ারের সুযোগ সুবিধা, সাধ্যের মধ্যে থাকা খরচের গৃহপ্রকল্প, ১০০টি স্মার্ট সিটি সবই সেই উদ্দেশ্যে। কিন্তু আমাদের আসল সত্যটা ভুলে গেলে চলবে না যে আস্তিনের তলায় আসল অস্ত্র ওরা লুকিয়ে রেখেছে। সাধারণ মানুষের ওপর যে আক্রমণ শুরু হয়েছে তার প্রভাব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দুভাবেই আমাদের উপর পড়বে। মনে রাখতে হবে বিজেপি-র স্লোগান 'ন্যূনতম সরকার, সর্বাধিক প্রশাসন'। 'ন্যূনতম সরকার' বা 'মিনিমাম গভর্নমেন্ট' আমাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করবে। তাই শ্রমজীবী মানুষের থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করার সকল কৌশল এড়িয়ে কৃষক-মেহনতি মানুষের সাথে আমাদের রাস্তায় নামাটাই হবে সঠিক কাজ। এই বাজেটই শেষ কথা নয়। নতুন সরকার 'অর্ডিন্যান্স' প্রথায় বিশ্বাসী। তাই বাজেটের বহির্ভূত আক্রমণ আরও বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে আগামী দিনে। নিত্যনতুন আক্রমণ নেমে আসবেই। অভিজ্ঞতা আমাদের শিখিয়েছে ইউ পি এ-র 'আম আদমি' কারা ছিল। নতুন সরকারের কার্যকলাপ বোঝাচ্ছে যে সুদিন 'কাদের' হবে। তাই সাধারণ মানুষ প্রতিবাদ-প্রতিরোধে লড়াই- সংগ্রামে অদূর ভবিষ্যতেই শামিল হবেন। সেখানে থাকব আমরাও। থাকতেই হবে। □

পথে নামবে কর্মচারী

(পঞ্চম পৃষ্ঠার পর)

উচ্চশিক্ষিত চুক্তিতে নিযুক্ত কর্মচারীদের আধিকারিকদের বাড়ীর কাজও করে দিতে হয়। চুক্তিপ্রথার মহিলা কর্মচারীদের অবস্থা আরও দুর্বিসহ। বিবাহিত চুক্তি প্রথার মহিলা কর্মচারীরা চাকুরী হারাবার ভয়ে গর্ভবতী হতে চাইছেন না। আরো নানা বঞ্চনা তাদের সইতে হয়। প্রতি তিন বছর অন্তর কাজের যোগ্যতার ভিত্তিতে নবীকরণ হয়। যেটা এককথায় বলা যায় আধিকারিকদের তুষ্ট করার উপর নির্ভরশীল। অথচ এই অংশের কর্মচারীরা পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে S.S.K/M.S.K. শিক্ষাক্ষেত্র সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে এবং খোদ সরকারী প্রশাসনে গুরুত্বপূর্ণ কাজে লিপ্ত রয়েছে। প্রশাসনে প্রতিনিয়ত চুক্তিপ্রথার কর্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে

আরেকদিকে স্থায়ী কর্মচারীর সংখ্যা অবসরজনিত কারণে হ্রাস পাচ্ছে। আগামী ২০২০ সালের পর রাজ্য প্রশাসন বা অন্যান্য ক্ষেত্রে চুক্তি প্রথার কর্মচারীরা সংখ্যাগরিষ্ঠে পরিণত হবেন। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি এই অংশের কর্মচারীদের স্থায়ীকরণের দাবি করছে এবং তৎসাপেক্ষে স্থায়ী সরকারী কর্মচারীদের মতো বেতনভাতা থেকে সমস্ত ধরনের সুযোগ সুবিধা দেওয়ার দাবি নিয়ে সংগঠিত হচ্ছে আগামী ১০ সেপ্টেম্বরের কর্মসূচী। চুক্তিপ্রথার কর্মচারীদের কাছে আমাদের আহ্বান আপনারও বিক্ষোভ সমাবেশে হাজির হোন। সমিতি, অঞ্চল, জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটিকে এঁদের কাছে সংগ্রামের বার্তা পৌঁছে দিতে হবে।

বিগত ইউ পি এ-২ সরকার ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের জন্য সপ্তম বেতন কমিশন গঠন করেছে। ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা সপ্তম বেতন কমিশনের বিচার্য্য বিষয় সমূহ অনুমোদন করেছে। ইতিমধ্যে সপ্তম বেতন কমিশনের কাজ শুরু হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের সমিতিগুলি ও কনফেডারেশন স্মারকলিপি পেশ করেছে। ৩১ জুলাই ২০১৪ স্মারকলিপি পেশের শেষ দিন। কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের সর্বভারতীয় কনফেডারেশন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি ও প্রশাসনের উচ্চ আধিকারিকদের নিয়ে জে সি এম (জয়েন্ট কনসালটেটিভ মেসিনারী) বলে একটি যৌথ ফোরাম আছে। সেই ফোরামের মিটিং-এ কনফেডারেশন ২০১১ থেকে পে-কমিশন কার্যকরী করার বক্তব্য উত্থাপিত করেছিল কারণ অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থায় প্রতি পাঁচ বছর অন্তর পে-রিভিউ হয়। ২০০৬ সালে বেতন কমিশন হয়েছিল। সেই অনুযায়ী ২০১১তে সপ্তম পে-কমিশন কার্যকরী করার দাবি উত্থাপিত হয়েছে। যৌথ সভা জে সি এম সেই দাবিতে ঐক্যমত হতে পারেনি সরকারী প্রতিনিধিদের বিরোধীতায়। পরবর্ত্তীতে জে সি এম-এর সভাতে বহু আলোচনার পর ২০১৪ সাল থেকে পে-কমিশন কার্য্যকরী করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয়। ভিত্তি ছিল, যেহেতু ২০১৪, ১ জানুয়ারি মহার্ঘভাতা ১০০ শতাংশ পূর্ণ হয়েছে। বর্তমানে সমিতি ও কনফেডারেশন কমিশনের কাছে অন্তর্বর্তীকালীন সুপারিশ এবং মার্জারের দাবি জানিয়েছে। সপ্তম বেতন কমিশন বলেছে নতুন কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের কাছে জানতে চাইলে আমরা অন্তর্বর্তীকালীন সুপারিশ ও মার্জারের বক্তব্য অনুমোদন করবো। স্বাভাবিকভাবেই ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে বেতন কমিশন গঠন নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে গত ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে পত্র দিয়ে ষষ্ঠ বেতন কমিশন গঠনের দাবি জানানো হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে বঞ্চনার পাহাড় তৈরি হয়েছে। রাজ্য সরকারের এব্যাপারে কোন হেল-দোল নেই। নন্-প্লানড্ বাজেটের অর্থে কর্মচারীদের দাবি না মিটিয়ে মেলা, উৎসব, রং-এর খেলায় মেতেছে রাজ্য সরকার। খাবার দেওয়ার মুরোদ নেই বিউটিফিকেশন হচ্ছে। দাবি দাওয়া নিয়ে আন্দোলন সংগঠিত করলে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। আমাদের সর্বস্তরের নেতা, কর্মী, কর্মচারীদের যেখানে খুশি হয়রানিমূলক বদলী করছে।

সরকারী কর্মচারীদের দাবি-দাওয়া আদায় এবং অধিকার অর্জনের একমাত্র সংগ্রামী সংগঠন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি, সেই সংগঠনের অনেক ত্যাগ তিতিক্ষার ঐতিহ্যবাদী ইতিহাস আজও অক্ষয়। অনেক চড়াই-উতরাই অতিক্রম করার অভিজ্ঞতালব্ধ, আক্রমণ, সন্ত্রাস মোকাবিলায় অকুতোভয়, আদর্শের প্রতি গভীর আস্থা রেখে সংগঠনের উত্তরাধিকারগণ প্রস্তুত বর্তমান খুন, সন্ত্রাস, ধর্ষণ, অরাজকতার কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলায়। সেই লক্ষ্যে কর্মচারীদের উপর আক্রমণ ও বিপুল বঞ্চনার প্রতিবাদে আগামী ১০ সেপ্টেম্বর রাজপথে নামুন। কর্মচারী সমাজের কাছে আমাদের আহ্বান ভয়ভীতিমুক্ত হয়ে আক্রমণ, সন্ত্রাস মোকাবিলায় অর্থনৈতিক অধিকার অর্জনের লক্ষ্যে রাজ্যের গণতান্ত্রিক পরিবেশ পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে শামিল হতে হবে।

ত্রয়োদশ রাজ্য সম্মেলন (২০০১)-র সেই আহ্বান যেন স্মরণে রাখি—

'এ তুফান ভারী
দিতে হবে পাড়ি।' □

রাজ্য কাউন্সিল সভা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

প্রতিপালিত পরবর্তী কর্মসূচী প্রশাসনের চিত্র পর্যালোচনায় তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কর্মচারী হিসাবে আমাদের করণীয় ইত্যাদি বিষয়ও পর্যালোচনায় এসেছে।

সাধারণ সম্পাদক বলেন যে, এবারের লোকসভা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে একটা নতুন দিক উন্মোচিত হয়েছে। বিগত ইউ পি এ-২ মন্ত্রীসভার নানা ধরনের ব্যর্থতা, ব্যাপক দুর্নীতি, লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধিজনিত জনরোষের সুযোগ নিয়ে চরম দক্ষিণপন্থী ও উগ্র সাম্প্রদায়িক দল নিরঙ্কুশ ক্ষমতা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারে আসীন হয়েছে। প্রায় দশ হাজার কোটি টাকা প্রচারকার্যে ব্যবহার করে বি জে পি সাধারণ মানুষ, এমন কি নব্য ভোটারদের সামনে এক নতুন দিন আসছে বলে প্রচারের ধোঁয়াশা তৈরিতে সমর্থ হয়েছে। এর সঙ্গে সমানতালে কাজ করেছে কর্পোরেট লবির স্বার্থে মিডিয়ার প্রচার। ফলে মাত্র ৩১ শতাংশ ভোট পেয়ে ২৮২ টি আসন পেয়েছে বি জে পি। যদিও ভারতীয় সংসদীয় গণতন্ত্রে ভোটের শতকরা হারের গুরুত্ব আসন সংখ্যার বিচারে খুব একটা বিচার্য নয়। কিন্তু বামপন্থী দলগুলি সব সময়ই ভোট প্রাপ্তির শতকরা হারকে জনসমর্থনের নিরীখে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে গণ্য করে থাকে। এবারকার লোকসভা নির্বাচনে ২/১ টি বাদে প্রায় সব আঞ্চলিক দলেরই ভোট প্রাপ্তির হারে অবক্ষয় ঘটেছে। বামপন্থীদেরও ভোটের হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। স্বাভাবিকভাবেই এর কিছু নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সংগ্রাম-আন্দোলনের কর্মীদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে একটা বৃহৎ অংশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হয় নি, এ ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা আশাপ্রদ ছিল না। প্রকৃত জনমতের প্রতিফলন এরাজ্যে ঘটেনি। তাহলে ভোটের ফলাফল অন্যরকম হতে পারতো। পরিস্থিতির এরকম বাঁকে দাঁড়িয়ে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেই সংগ্রামকে এগিয়ে নিতে হবে। রাজ্য সরকারের চোখ রাঙানী, বদলীর হুমকীর সামনে কোনমতেই আমরা মাথা নত করবো না।

এই বক্তব্যের পাশাপাশি আসন্ন সংগ্রাম-আন্দোলনগত, সংগঠনগত বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে কাউন্সিলের বিবেচনার জন্য সাধারণ সম্পাদক প্রস্তাবনা রাখেন। উপস্থিত সমস্ত জেলা ও অঞ্চল কমিটি এবং কয়েকটি সমিতির আলোচনার শেষে সমস্ত বক্তব্য গুটিয়ে এনে জবাবী ভাষণ

দেন যুগ্ম-সম্পাদক অসিত ভট্টাচার্য। সভা থেকে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি গৃহীত হয়েছে।

সাংগঠনিক বিষয়ে

(১) আগস্ট ২০১৪ সালের মধ্যে সমস্ত সমিতির সদস্যপদ নবীকরণের কাজ সমাপ্ত করতে হবে। সংগঠনের সর্বস্তরের নেতৃত্বকে একাজে সরাসরি যুক্ত হতে হবে, সদস্য সংগ্রহ অভিযানের তথ্যভিত্তিক রিপোর্ট কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে পাঠাতে হবে।

(২) সংগ্রামী হাতিয়ার ও এমপ্লয়িজ ফোরামের গ্রাহক সংগ্রহের বকেয়া কাজ দ্রুত গুটিয়ে তার তথ্য কেন্দ্রীয় দপ্তরে জমা দিতে হবে প্রাপ্য অর্থসহ। পত্রিকাবন্টনে তৎপরতা বাড়াতে হবে।

(৩) সংগ্রামী হাতিয়ারের ক্ষেত্রে বকেয়া অর্থসমূহ দ্রুত কেন্দ্রীয় দপ্তরে জমা দিতে হবে।

(৪) কয়েকটি সমিতির রাজ্য সম্মেলনের স্থান, তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে।

(৫) সর্বস্তরের সাংগঠনিক কমিটিগুলির পারস্পরিক সমন্বয় বৃদ্ধি ও সাংগঠনিক কাজগুলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষে কমিটি গত তৎপরতা বৃদ্ধি করতে হবে, এজন্য ঊর্ধ্বতন কমিটির পক্ষ থেকে সর্বনিম্ন ইউনিট পর্যন্ত সমিতিগত এবং রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিগতভাবে উভয়দিক থেকেই বৈঠক করতে হবে। এজন্য সাংগঠনিক সফর করা হবে।

এছাড়া কলকাতার ৭টি অঞ্চলের সম্পাদকমণ্ডলীর সাথেও কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বৈঠক করবেন।

(৬) সাংগঠনিক সফর —

* ১৫ জুলাই থেকে ২৫ জুলাই, ২০১৪ — রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির জেলা কমিটিগুলির পক্ষ থেকে ব্লকস্তর পর্যন্ত সফর করা হবে।

* ৩০ জুলাই থেকে ১৭ আগস্ট, ২০১৪ — সমিতিগুলির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ইউনিটস্তর পর্যন্ত সফর করবেন। সফরকালে জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সাথে বৈঠক করবেন। বিভিন্নস্তরে বৈঠকের সময় রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্ব উপস্থিত থাকবেন।

* ১৮ আগস্ট থেকে ৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ — রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ব্লকস্তর পর্যন্ত সফর করবেন।

* অন্তর্ভুক্ত সমস্ত সমিতির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সাথে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী বসবেন।

* মূলতঃ ৫ দফা গুরুত্বপূর্ণ দাবিকে সামনে রেখে এই সফর হবে। এর সঙ্গে সমিতিগতভাবে খুবই জরুরী ভিত্তিতে ২/১টি দাবি যুক্ত করা যেতে পারে। দাবিগুলি নিয়ে পোস্টার ও লিফলেট দেওয়া হবে।

দাবিগুলি পৃথকভাবে দেওয়া হল!

* জুলাই-আগস্ট মাস ব্যাপী রক্তদান, মিলন মেলা, সদস্য পরিবারের ছাত্র-ছাত্রীদের সম্বর্ধনা ইত্যাদি সামাজিক কর্মসূচী প্রতিপালন করতে হবে।

আন্দোলনগত কর্মসূচী

বর্তমান রাজ্য সরকারের হয়রানিমূলক বদলী বন্ধের দাবি, ৪২ শতাংশ মহার্ঘভাতা প্রদান, ৮.৩৩ শতাংশ বোনাস প্রদান সাপেক্ষে কর্মচারীদের উৎসবের পূর্বেই বোনাস প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ, ৬ষ্ঠ বেতন কমিশন গঠন সহ অন্যান্য দাবি জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে পত্র দেওয়া হয়েছে।

এই দাবিগুলিকে নিয়ে বৃহত্তর সংগ্রাম-আন্দোলন গড়ে তোলা হবে —

(১) আগামী ১০ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ বেলা ৩টায় কলকাতা ও শিলিগুড়িতে কেন্দ্রীয়ভাবে কর্মচারী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলির কর্মচারীরা কলকাতায় এবং উত্তরবঙ্গের কর্মচারীরা শিলিগুড়ির সমাবেশে বিপুলভাবে জমায়েত হবেন। এখন থেকেই এই কর্মসূচির প্রচার প্রস্তুতির কাজ শুরু করে দিতে হবে।

(২) সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের আহ্বানে ২০ আগস্ট ২০১৪ দাবি দিবস কর্মসূচী কেন্দ্রীয়ভাবে কর্মচারী ভবনে অনুষ্ঠিত হবে।

তাছাড়া, নভেম্বর মাস থেকে সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের বিপদ নিয়ে শিক্ষামূলক আলোচনা সভা সংগঠিত করতে হবে। □

পরমেশ দে

শুভেন্দু মানিক্য সেনগুপ্ত

জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

এছাড়াও উল্লেখিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক পরিস্থিতি, মহিলাদের মর্যাদাহানি ও রাজ্যব্যাপী হিংসা ইত্যাদি বিষয়। রেল ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে আলাদা করে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। দুই দিনের সভাটি পরিচালনার মূল দায়িত্বে ছিলেন সংগঠন-এর সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান সুকোমল সেন।

ঐ সভা থেকে পাঁচ দফা দাবিকে কেন্দ্র করে আগামী ২০ আগস্ট দেশব্যাপী 'দাবি দিবস' কর্মসূচী প্রতিপালনের আহ্বান জানানো হয়েছে। সভা শেষের বক্তব্যে তিনি উত্থাপন করেন সমগ্র বিশ্ব দ্রুত গতিতে পরিবর্তিত হচ্ছে। সুতরাং সমগ্র শ্রমিক শ্রেণীকে এই পরিবর্তিত পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করতে হবে। **পাঁচ দফা দাবি ঃ ১। অবিলম্বে PFRDA বিল বাতিল করতে হবে। ২। স্থায়ী শূন্য পদ অবিলম্বে পূরণ করতে হবে। ৩। অস্থায়ী চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীদের স্থায়ীকরণ করতে হবে। ৪। 'শ্রম আইন' নীতিকে শ্রমিক স্বার্থে ব্যবহার করতে হবে। ৫। পে-কমিশন-এর সুযোগগুলি অবিলম্বে কার্যকরী করতে হবে।** এছাড়াও এমপ্লয়িজ ফোরাম পত্রিকাটির গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি ও বকেয়া মিটিয়ে ফেলার আহ্বান রাখা হয়েছে। পরবর্তী সভা ১২-১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৪ ত্রিপুরার আগরতলায় অনুষ্ঠিত হবে ঘোষিত হয়েছে।□ **শিখা মুখার্জী**

১২ই জুলাই কমিটির প্রতিষ্ঠা দিবস

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

কর্মবিরতি। মাধ্যমিক শিক্ষক-প্রাথমিক শিক্ষক-সরকারী কর্মচারী সকলেই রাজপথে পুলিশের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ব্যারিকেড, ছাত্ররা রাজপথে, আমাকে আবার সুদীপ্তর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে, ছাত্ররা ব্যারিকেডে, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি-মার্চ-এপ্রিল-মে-জুন-জুলাই এরকম একটা উত্তাল গণ আন্দোলনের শীর্ষে ১২ই জুলাই কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী, রাজ্য সরকারী কর্মচারী, শিক্ষকরা আর জেলায় জেলায় সেই ঐতিহাসিক জমায়েতের মধ্য দিয়ে ১২ই জুলাই কমিটি গঠিত হয়েছিল।"

—১২ই জুলাই কমিটির প্রতিষ্ঠা দিবসের সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথাগুলি বলেন রাজ্য বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা সূর্যকান্ত মিশ্র গত ১৪ই জুলাই ২০১৪, বাগবাজার ফণীভূষণ বিদ্যাবিনোদ যাত্রা মঞ্চে।

এদিন সমাবেশ পরিচালনা করে অনুপ চক্রবর্তী, সমর চক্রবর্তী ও উৎপল রায়কে নিয়ে গঠিত সভপতিমণ্ডলী। শোকপ্রস্তাব ও নীরবতা পালনের

সমীর ভট্টাচার্য

পরবর্তীতে সমাবেশের প্রধান বক্তা রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা সূর্যকান্ত মিশ্রকে পুষ্পস্তবক দিয়ে অভিনন্দিত করেন ১২ই জুলাই কমিটির অন্যতম যুগ্ম-আহ্বায়ক সমীর ভট্টাচার্য।

'গণতান্ত্রিক ও ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারের উপর আক্রমণ প্রতিহত কর এবং দাবি-দাওয়া আদায়ের পথ প্রশস্ত কর' — ৪৯তম প্রতিষ্ঠা দিবসের এই আহ্বানকে সামনে রেখে ৮-দফা দাবিসহ আগামী আন্দোলন কর্মসূচীর প্রস্তাব পেশ করেন অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক সমীর ভট্টাচার্য। একই সঙ্গে গাজা ভূখণ্ডে ইজরায়েলী বিধ্বংসী আক্রমণের বিরুদ্ধেও একটি আলাদা প্রস্তাব তিনি পেশ করেন। উত্থাপিত দুটি প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন ১২ই জুলাই কমিটির অপর যুগ্ম আহ্বায়ক তপন দাশগুপ্ত।

পরবর্তীতে কর্মী সমাবেশের মূল বক্তা সূর্যকান্ত মিশ্র তার বক্তব্যের শুরুতেই উত্থাপিত দুটি প্রস্তাবকেই সমর্থন করেন। আসন্ন সংগ্রামকে সমর্থন জানিয়ে তিনি আরও বলেন, বর্তমান সময়ে আক্রমণ ঘটছে ত্রিমাত্রিক। প্রথম আক্রমণ দেশের গণতন্ত্রের ওপর আক্রমণ, রাজ্যের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর আক্রমণ, দ্বিতীয়ত মেহনতী মানুষের, শ্রমজীবী মানুষের ঐক্যের ওপর আক্রমণ আর তৃতীয়ত জীবন জীবিকার ওপর আক্রমণ। এই ত্রিমাত্রিক আক্রমণ মোকাবিলা করা এক নতুন চ্যালেঞ্জ আমাদের কাছে। দেশের বর্তমান শাসক দল যে ইস্যুকে সামনে এনে গুজরাট মডেলের নামে ক্ষমতায় এসেছে তার উত্তাপ পশ্চিমবঙ্গে একমাত্র হ্রাস করতে পারে মেহনতী মানুষের ঐক্য। শ্রমজীবী মানুষের যে সংগ্রাম আন্দোলন তাকে সংহত করে, একই সাথে গণতন্ত্র, একই সাথে ধর্মনিরপেক্ষতার ওপর আক্রমণ, মানুষের জীবন জীবিকার ওপর আক্রমণ এই তিন আক্রমণকে মোকাবিলা করে অগ্রসর হওয়া সম্ভব। উপস্থিত সকলে প্রস্তাব দুটিকে সমর্থনের পরবর্তীতে সভাপতিমণ্ডলী সভার সমাপ্তি ঘোষণা করে। সভায় সহস্রাধিক শ্রমিক-কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।□

দেবাশীষ রায়

প্রয়াত কমরেড সুশীল কুমার দাস

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

শ্রদ্ধা নিবেদন

অজয় মুখার্জী

সুকোমল সেন

প্রণব চট্টোপাধ্যায়

অশোক পাত্র

মিলন দাস

অজয় সেন

পশ্চিমবঙ্গে আসার পরে তিনি প্রথমে কারা অধিকারে ১৯৪৮ সালের নভেম্বর মাসে অস্থায়ীভাবে চাকরিতে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ১৯৫১ সালে লোকসেবা আয়োগের পরীক্ষার মাধ্যমে তিনি সচিবালয়ে করনিক পদে সমবায় বিভাগে যোগদান করেন। সরকারী চাকরিতে যোগদানের পরবর্তী দিন থেকেই সংগঠনের সক্রিয় কর্মী হিসাবে নিজেকে নিয়োজিত করেন। পুনরায় ১৯৫২ সালে নবপর্যায় সংগঠন গড়ার উদ্যোগ শুরু হয় এবং তিনি সেখানেও অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন। পশ্চিমবঙ্গ সেক্রেটারিয়েট এমপ্লয়িজ এ্যাসোসিয়েশন নবপর্যায় পর্বে সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কমরেড দাস তৎকালীন নেতৃবৃন্দ পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়, অজয় মুখোপাধ্যায়, নিতাইহরি কর মজুমদার সহ অন্যান্যদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রতিপালন করেন। তাঁর অসাধারণ সাংগঠনিক ক্ষমতার জন্য সমগ্র কর্মচারী মহলে তিনি অচিরেই জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। তিনি এই সংগঠনে ১৯৬৫-৬৭ সাল পর্যন্ত যুগ্ম-সম্পাদক ও ১৯৬৮-১৯৭৭ সাল পর্যন্ত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৬ সালে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের বিভিন্ন সংগঠনের যৌথ মঞ্চ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন গঠনেও তিনি অসামান্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। বিভিন্ন সমিতি ও জেলার কর্মী-নেতৃত্বের সঙ্গে ছিল তাঁর আত্মিক যোগাযোগ। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মহাকরণ অঞ্চল কমিটির প্রথম আহ্বায়ক ও পরবর্তীতে সম্পাদক ছিলেন কমরেড দাস।

কর্মচারী আন্দোলনকে শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পরিচালনার অপরাধে ১৯৭৫ সালে ২৫ জুন অভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থা জারি হওয়ার পরবর্তীতে তিনি সহ ১৪ জন সংগঠককে 'মিসা'-য় গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং জেলের অভ্যন্তরে রাজ্যপালের বিশেষ ক্ষমতাবলে সংবিধানের ৩১১(২)(গ) ধারায় কোনো কারণ না জানিয়ে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো সুযোগ না দিয়ে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে অন্যান্যদের সাথে তিনিও চাকরিতে পুনর্বহাল হন। কমরেড দাস প্রশাসনেও একজন দক্ষ কর্মচারী ছিলেন। অন্যদিকে কমরেড দাসের সহজ-সরল লেখনীতে সংগঠনের ইতিহাস বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বিধৃত আছে। একইসাথে অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর লেখাগুলি আজও প্রাসঙ্গিক ও সমুজ্জ্বল।

বিরল ব্যক্তিত্বের অধিকারী এই মানুষটি ১৯৭৯ সালের ৩১ মার্চ চাকরি থেকে অবসরগ্রহণ করেন। যদিও তিনি সংগঠন থেকে অবসরগ্রহণ করেননি। ১৯৮৮ সালে কমরেড নরেন গুপ্তের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী পেনশনার্স সমিতির গঠনপর্ব থেকে তিনিও এই সংগঠনটি পরিচালনার সাথে যুক্ত হন এবং দীর্ঘ সময় সংগঠনের কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য এবং কেন্দ্রীয় উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করেছেন।

কমরেড দাস সমাজজীবনের ক্ষেত্রেও ছিলেন সমদায়িত্বশীল। বেলঘরিয়ায় নিজস্ব বাসস্থান এলাকায় বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক কাজে তিনি অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতেন। তাঁর বিরল গুণাবলীর জন্য বেলঘরিয়ার বিস্তীর্ণ এলাকায় তিনি ছিলেন জনপ্রিয়, শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি। সহজ-সরল অনাড়ম্বর জীবন আদর্শে পরিচালিত, সদালাপী, বিনয়ী, আত্মপ্রচারবিমুখ, শ্রেণী আন্দোলনের প্রতি গভীর মমত্ববোধের অধিকারী কমরেড সুশীল দাসের প্রয়াণে সমগ্র কর্মচারী আন্দোলন হারাল তাঁদের সংগ্রামের এক আপসহীন সহযোদ্ধাকে। □

কমরেড সুশীল দাসের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয় গত ২৩ জুলাই। এই সংক্রান্ত রিপোর্ট পরবর্তী সংখ্যায় থাকবে।

Editor : SUMIT BHATTACHARYA
SANGRAMI HATIAR

State Co-ordination Committee
43rd Year 3rd Issue, July 2014

Regd. No. : 18484/71
Price : One Rupee

ত্রিপুরায় ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে বামফ্রন্টের চমকপ্রদ জয়

মহুয়া রায়, ত্রিপুরা

উৎসবের মেজাজে শান্তিপূর্ণ ও অবাধ ভোটের ঐতিহ্য অম্লান রেখেই বামফ্রন্ট ৯৫ শতাংশ পঞ্চায়েত এবং সব কটি জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতিতে ত্রিপুরার গ্রামীণ জনগণের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। দেশবাসী ফের একবার দেখলেন সুন্দর গণতান্ত্রিক পরিমণ্ডলে বিকাশমান, বিকল্পের ধ্রুবতারা পূর্বোত্তরের ছোট্ট ত্রিপুরাকে। ২০১১ তে বামফ্রন্টের শক্ত ঘাঁটি প্রধান দুই রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ ও কেরলের সাময়িক বিপর্যয়ের পর ২০১৩-র বিধানসভা নির্বাচন, ২০১৪-র লোকসভা ভোটে সারা দেশে কর্পোরেট পুঁজিপুষ্ট মোদি ঝড়ের মধ্যেও ত্রিপুরার জনগণ সর্বোচ্চ ভোটদানের রেকর্ডই শুধু নয়, বামদুর্গকে আরো মজবুত করেছেন।

একনজরে ২০১৪য় অনুষ্ঠিত ত্রিপুরা ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফল

জেলা পরিষদ - ৮টি (সবকটি বামফ্রন্টের দখলে)

মোট আসন	বামফ্রন্ট	কংগ্রেস	তৃণমূল	বিজেপি
১১৬ টি	১১৫	০১	০	০

পঞ্চায়েত সমিতি— ৩৫টি (সবকটি বামফ্রন্টের দখলে)

মোট আসন	বামফ্রন্ট	কংগ্রেস	তৃণমূল	বিজেপি	ত্রিশঙ্কু
৪১৯ টি	৪০৯	০৯	০	০	১

গ্রাম পঞ্চায়েত	বামফ্রন্ট	কংগ্রেস	তৃণমূল	বিজেপি	অন্যান্য
৫৯১ টি —	৫৬৩	১৮	৩	৫	২

প্রসঙ্গত, গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৪টি, ২৩টি ও ৫১১টি। এবার প্রশাসনিক কাঠামোর পুনর্বিন্যাসের ফলে তা বেড়ে হয় ৮টি, ৩৫টি ও ৫৯১টি।

৮টি জেলা পরিষদে ১১৬টি আসন, ৩৫টি পঞ্চায়েত সমিতিতে ৪১৯টি আসন ও ৫৯১টি গ্রাম পঞ্চায়েতে মোট আসন ৬১১১টি। এর মধ্যে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জেলা পরিষদের ২টি, পঞ্চায়েত সমিতির ৩৮টি এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের ৯৮০টি আসনে জয়ী হয় বামফ্রন্ট। এবারের নির্বাচনে রাজ্যে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতেও পদাধিকারী সহ ৫০ শতাংশ আসন ছিল মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। ১৫ জুলাই হয় ভোট গ্রহণ। ভোট পড়ে প্রায় ৯০ শতাংশ। ভোট গ্রহণ ছিল সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ।

ঐতিহ্যশালী দল কংগ্রেসকে প্রায় সম্পূর্ণ বর্জন করেছে গ্রাম ত্রিপুরা, বিজেপি-র ৫ আর তৃণমূলের ৩ পঞ্চায়েত দখলও কংগ্রেসের সৌজন্যেই। বামেদের এই বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণ হিসাবে উল্লেখ্য, শান্তি, সম্প্রীতি, উন্নয়নের পথে বামেদের ধারাবাহিক অবস্থান নিঃসন্দেহে অন্যতম প্রধান কারণ। মহিলাদের জন্য সর্বস্তরে, এমনকি শুধুমাত্র ত্রিপুরায় চেয়ারম্যান ও প্রধান পদেও অর্ধেক আসন সংরক্ষণ একটি যুগান্তকারী ঘটনা। ৮০ শতাংশের বেশী আসনে নতুন প্রার্থী দেওয়াও বিপুল উদ্দীপনা জাগিয়েছে। ত্রিপুরার জনগণের অর্জিত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হচ্ছে একমাত্র বামফ্রন্ট শান্তি, উন্নয়ন, সমৃদ্ধির গ্যারান্টি। ৮৮ সালে নির্বাচিত পঞ্চায়েত ভেঙে, এ ডি সি কিংবা ভিলেজ কমিটিতে যথেচ্ছ লুণ্ঠন করে জোট রাজত্বের পাঁচ বছরে অজস্র কুকীর্তি করে বামবিরোধীরা মানুষের আস্থা হারিয়েছে। দুঃস্বপ্নের সেই কালো রক্তাক্ত দিনগুলির স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা গ্রাম ত্রিপুরার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মনে গণতন্ত্রনিধনকারী, গুন্ডারাজ কায়েমকারীদের জন্য শুধুই ঘৃণা সঞ্চিত করেছে।

ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার এক বিবৃতিতে বলেছেন, এই রায়ের মাধ্যমে ত্রিপুরার জনগণ বামফ্রন্ট সরকারের প্রতি ওদের আস্থা ও বিশ্বাস পুনর্ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু এই চমকপ্রদ জয়ে আত্মসন্তুষ্টি এবং আত্মশ্লাঘার কোনো অবকাশ নেই। এই রায় বামফ্রন্ট তথা বামফ্রন্ট সরকারের দায়িত্ব আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। এই কথা মনে রেখেই যথাযথভাবে ত্রিপুরার জনগণের পরামর্শ ও সহযোগিতা নিয়ে স্বীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে প্রস্তুত হতে হবে।□

আন্তর্জাতিক সংবাদ

গাজায় অবিরাম ইজরায়েলী হামলা

গাজার ওপর অবিরাম হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইজরায়েল। বেপরোয়া হামলায় প্রতিবন্ধী সংগঠনের দপ্তর পর্যন্ত বাদ যায়নি। ইজরায়েলী বাহিনীর নৃশংস আক্রমণের হাত থেকে এমনকি হাসপাতালও বাদ যাচ্ছে না। আক্রান্তরা অধিকাংশই সাধারণ মানুষ। নিহতের সংখ্যা সহস্রাধিক, জখম মানুষের সংখ্যা প্রায় কয়েক হাজার। গাজার যোদ্ধারাও পাল্টা রকেট হামলা চালাচ্ছে ইজরায়েল অধিকৃত ভূখণ্ডে। তবে তাতে কোনও প্রাণহানি কিংবা গুরুতর জখম হওয়ার ঘটনা ঘটেনি।

গাজার স্বাস্থ্যমন্ত্রকের মুখপাত্র আশরফ আল কুদরা জানান, গাজা শহরের উত্তরে বেইত লাহিয়া এলাকায় প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ করছে এমন একটি চ্যারিটি এ্যাসোসিয়েশনের দপ্তরে বিমান হামলায় দু'জন মহিলার মৃত্যু হয়েছে। গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে একটি ব্যাঙ্ক, দু'টি মসজিদ-সহ হামাস নেতাদের

বাড়ি। কুদরা জানিয়েছেন, গত পাঁচদিনের হামলায় আহতের সংখ্যা ৯৪০। ২০১২ সালের নভেম্বরে আটদিন ধরে ইজরায়েলের হামলার পর সবচেয়ে রক্তাক্ত দিন কাটাচ্ছে গাজা। ওই আটদিন ইজরায়েলী হামলায় নিহতের সংখ্যা ছিল ১৭৭। জখম হয়েছিলেন ১৩০০'র বেশি প্যালেস্তিনীয়।

এক ব্রিটিশ দৈনিক দাবি করেছে, গাজার আকাশে ইজরায়েলের ছোঁড়া ক্ষেপনাস্ত্রের ধোঁয়া ও আগুন দেখতে এক পাহাড়চূড়ায় জড়ো হয়েছিলেন অন্তত ৫০ জন ইজরায়েলী। দৈনিকটি জানিয়েছে, পপকর্ণ খেতে খেতে গাজার হত্যালীলা উপভোগ করতে এসেছিলেন তাঁরা। সে সময়ের একটি ছবি টুইটারে ছড়িয়ে পড়ার পর প্রবল প্রতিক্রিয়াও হয়। সে ছবির সত্য মিথ্যা অবশ্য জানা নেই। যা জানা গেছে তা হল এ দিন সকালে গাজায় হামলার পর দুপুরে বিমান থেকে বেইত লাহিয়া শহরে লিফলেট ফেলতে শুরু করে আই ডি এফ। তাতে লেখা ছিল, 'সন্ত্রাসবাদীদের এলাকা এবং সন্ত্রাসের সরঞ্জাম যেখানে তৈরি হচ্ছে দু'জায়গাতেই হামলা চালাবে ইজরায়েলের সেনা।' এমনকী কোন কোন জায়গায় হামলা চালানো হবে, তারও একটা তালিকা দেওয়া হয়েছে ওই লিফলেটগুলিতে। বার্তা একটাই। সময় থাকতে এলাকা ছেড়ে যেন পালিয়ে যান বাসিন্দারা। কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে বেইত লাহিয়ায় এক লক্ষেরও বেশি বাসিন্দা কোথায় যাবেন, তার ঠিক নেই। অন্য দিকে, গাজার প্রায় চার হাজার বাসিন্দা ইতিমধ্যেই ঘর-দোর ছেড়ে রাষ্ট্রপুঞ্জের ত্রাণ সংস্থায় আশ্রয় নিয়েছে। তথ্য বলছে, পরপর ছ'দিনে গাজায় তেরোশোরও বেশিবার বিমান হানা চালিয়েছে ইজরায়েল। তাতে ৩০টিরও বেশি শিশুর প্রাণ গিয়েছে। সব মিলিয়ে ত্রাসের পরিস্থিতি তৈরির অভিযোগ উঠেছে আই ডি এফ-এর বিরুদ্ধে। সর্বশেষ খবর অনুযায়ী গাজায় ইতিমধ্যেই সংঘর্ষ বিরতির প্রস্তাব দিয়েছে মিশর ও আমেরিকা। রাষ্ট্রপুঞ্জের খবর অনুযায়ী, গাজায় এখনও লক্ষাধিক মানুষ ত্রাণ শিবিরে রয়েছেন। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির মতে এত বিপুল সংখক মানুষকে ত্রাণ সরবরাহ করা কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়েছে। □

অরিন্দম ব্যানার্জী
পরমেশ দে

মারণরোগের কবলে রাজ্য

গত তিন বছর ধরে আমরা পশ্চিমবঙ্গবাসীরা অনেক মৃত্যু মিছিলের সাক্ষী হয়েছি। কখনো অপুষ্টিতে শিশুমৃত্যু, কখনো উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাবে সদ্যজাত শিশু মৃত্যু। কখনো বা বন্ধ কলকারখানা, চা বাগানের শ্রমিকদের অনাহারে মৃত্যু। সম্প্রতি জুলাই মাসের প্রথমার্ধ থেকেই রাজ্যের অন্যতম মনোরম অঞ্চল উত্তরবঙ্গে শুরু হয়েছে এনসেফ্যালাইটিসের মৃত্যু মিছিল। কার্যত জুলাই'১৪ মাসের প্রথমার্ধ থেকেই এনসেফ্যালাইটিসের ও জাপানী এনসেফ্যালাইটিসের দাপাদাপিতে উত্তরবঙ্গের মানুষ নাজেহাল হয়ে যাচ্ছেন। প্রতিদিনই বহু মানুষ জ্বর মাথাব্যাথা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছেন। মূলত কালিম্পং, মিরিক, বিজনবাড়ি, মাটিগাড়া ও নকশালবাড়ি, ফাঁসিদেওয়া ও খড়িবাড়ি, ধূপগুড়ি, ডুয়ার্স, কালচিনি, ময়নাগুড়ি সহ কোচবিহারের বিভিন্ন ব্লকে এই রোগটি ক্রমশ ছড়িয়ে পড়েছে। ব্লক মহকুমাগুলির স্বাস্থ্য পরিকাঠামো সঠিক না থাকায় প্রায় সব রোগীকেই উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালেই পাঠানো হচ্ছে। এই পর্যন্ত (২৫/৭) শুধু উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালেই মারা গেছেন ৮০ জন এছাড়াও সরকারী হিসাবে মোট ১২২ জন মারা গেছেন, বেসরকারীভাবে এই সংখ্যা আরো বেশী। আক্রান্ত প্রায় পাঁচশতর বেশী। যদিও জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সংখ্যা ১৫০ ছাড়িয়ে গেছে। বর্তমানে রোগটি মহামারীর আকারধারণ করেছে, কিন্তু রাজ্য সরকার নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে মহামারী ঘোষণা করতে নারাজ।

এই রোগটি মশাবাহিত ভাইরাল রোগ। এই কিউলেক্স মশা সাধারণত জন্মায় ধানক্ষেতের জলে এবং নোংরা আবর্জনাযুক্ত জলে। রোগটি মূলত মস্তিষ্কের মেমব্রেনে প্রদাহ সৃষ্টি করে। এরফলে হাই ফিভার, মাথা ব্যাথা ইত্যাদি লক্ষ্ণ দেখা দেয়। পরবর্তীতে ঠিকমতো চিকিৎসা না হলে ক্রমশ ব্রেন ড্যামেজ হয়ে গিয়ে মৃত্যু হয়।

জুলাই মাসেই স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী উত্তরবঙ্গ চা বাগান পরিদর্শনে যান, সেই সময় রোগটির প্রাদুর্ভাব শুরু হয়ে গেছে। সাংবাদিকরা তাঁকে এব্যাপারে জিজ্ঞসা করলে তিনি বলেন, আমাদের কাছে কোন খবর নেই। খবর যদিও না থাকে স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী হিসাবে তিনি একবারও খোঁজ নিয়ে বিষয়টির সত্যতা যাচাই করেন নি। পরে ১৭ জুলাই ১৪ স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গে একটি শিলান্যাস অনুষ্ঠানে যান এবং তিনিও যথারীতি কোন খোঁজ না নিয়ে শুধুমাত্র রাজনৈতিক কার্যসিদ্ধি করেই ফিরে আসন। তখন তিনি ব্যস্ত ২১ জুলাই ২০১৪ তাঁর দলের নাচ গানের কর্মসূচী নিয়ে। কে বা কারা অসুস্থ হলো বা মারা গেলো সেসবে তাঁর কোন মাথাব্যাথা নেই। আক্রান্ত

জেলাগুলি সহ সমস্ত রাজ্যের ব্লক/মহকুমাস্তরে এমনকি জেলা স্তরেও প্রয়োজনের তুলনায় ডাক্তার নার্স অনেক কম। হাসপাতালের পরিকাঠামো পরিষেবা দেয়ার উপযুক্ত নয়। নেই পর্যাপ্ত ওষুধ, সিরিঞ্জ, ব্লাড স্লাইড ইত্যাদি। সরকারী ক্লিনিকগুলিতে ঠিকমতো কাজ করা যাচ্ছে না। কোচবিহার জেলার এম জে এন হাসপাতাল, জে ডি হাসপাতালে মশার আঁতুড়ঘর হয়ে আছে জল জমে। নিকাশি ব্যবস্থা নেই। দুটি হাসপাতালেই জঞ্জালের স্তূপ। জে ডি হাসপাতালের আশেপাশে বিচরণ করে বেড়াচ্ছে শুয়োর। স্বাভাবিকভাবেই এই রোগটি যখন মহামারী রূপ নিচ্ছে তখন স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী পরিকাঠামো ও পরিষেবার উন্নতি না করে তিনি ব্যস্ত হয়েছেন জেলা স্বাস্থ্য অধিকর্তাদের ও সুপারিনটেনডেন্টকে সাসপেন্ড করতে। এমনকি উত্তরবঙ্গে তাঁর দলের লোকেরাও মানুষের এই জীবন মৃত্যু নিয়ে নিজেদের মধ্যে দলাদলির রাজনীতি করে রাজ্য সরকারের ব্যর্থতা ঢাকার চেষ্টায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। রাজ্য সরকার যদি সঠিক সময়ে সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতো তাহলে আশিজন মানুষকে এই মারণরোগের কবলে পড়তে হতো না। উল্লেখ্য বিগত বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে ২০০৬ ও ২০০৯ সালে এই মারণ রোগটি দেখা দেওয়ায় খুব দ্রুততা ও দক্ষতার সাথে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করায় দ্রুত নিয়ন্ত্রণ করা গেছিলো।□

কুমকুম মিত্র

সম্পাদক ঃ সুমিত ভট্টাচার্য
সহযোগী সম্পাদক ঃ মানস কুমার বড়ুয়া
যোগাযোগ ঃ দূরভাষ-২২৬৪-৯৫৯৩, ২২৬৫-০৯২৬ ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২২১৭-৫৫৮৮
ওয়েবসাইট ঃ www.statecoord.org
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১০-এ শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪, হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কোঃ অপঃ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিঃ ১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত।